অন্নদাশঙ্কর রায়

ইউরোপের চিঠি

কলিকাতা
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ

প্রকাশক
শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এর প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা

প্রথম প্রকাশ ১৯৪৩

দাম দেড় টাকা

মুদ্রক
শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস
৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট কলিকাতা-৬

৫৫৫২

মৌচাক সম্পাদক

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

করকমলেষু—

অন্নদাশঙ্কর রায়

ছোটদের উপন্যাস

পাহাড়ী

ভূমিকা

এগুলি প্রবন্ধ নয়, চিঠি। লেখা হয়েছিল "মৌচাক" মাসিকপত্রের পাঠক পাঠিকাদের জন্যে। কোনোটি ট্রেনে বা জাহাজে, কোনোটি কাফেতে।

তার পরে পনেরো ষোলো বছর কেটে গেছে। এত দিন এই চিঠিগুলি মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় গোপন ছিল। এখন এদের পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হলো। যারা পড়বে তারা আরেক যুগের ছেলে মেয়ে। তাদের সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান অনেক। কিন্তু তখনকার সেই আমি তো তাদের কাছাকাছি বয়সের।

এবার যে সব ছবি দেওয়া গেল সেগুলি আমার বন্ধু শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তিনি ও আমি এক সঙ্গে ইউরোপের নানা দেশ বেড়াই। আমাদের তখনকার সহযাত্রার স্মারক হিসাবে এই বইখানির কিছু মূল্য আছে।

ভাদ্র, ১৩৫০ **অন্নদাশঙ্কর রায়**

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে দুটি লেখা সংযোজিত হলো। "মিলানোতে মিলন" খুঁজে বার করেছেন শ্রীমান্ সুপ্রিয় সরকার আর "দেশে" উদ্ধার করেছেন শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ পাল। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কয়েকটি বাদে আর সব ছবি নতুন। এগুলি মণিদার সংগ্রহ থেকে নেওয়া। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

অন্নদাশঙ্কর রায়

সূচী

সুইটজারল্যাণ্ড

সুইটজারল্যাণ্ড হচ্ছে ইউরোপের মধ্যপ্রদেশ। আমাদের যেমন বিন্ধ্য পর্বত, ওদেরও তেমনি আল্পস্ পর্বত। আল্পসের শাখা প্রশাখায় দেশটা ছেয়ে গেছে, আর সেই সব শাখা প্রশাখার মাঝে মাঝে এক একটি হ্রদ। দেশটি যেমন সুন্দর তেমনি স্বাস্থ্যকর। বৎসরের অধিকাংশ দিন বরফ পড়ে বা বরফ থাকে, পাহাড়ের চূড়া থেকে ঘরের আশপাশ অবধি কেবল শাদা মখ্‌মলের মতো বরফ বিছানো! আমাদের দেশে যেমন "চলতে গেলে দলতে হয় রে দুর্বা কোমল" ওদের দেশে তেমনি চলতে গেলে দলতে হয় দুগ্ধ ফেননিভ রাশি রাশি বরফ। রাস্তার ওপরে ধূলোর মতো বরফ গুঁড়ো জমে রয়েছে, তার ওপরে পা ফেলতে মায়া হয়। চক্‌খড়ির গুঁড়োর ওপর হাঁটবার সময় কেমন মনে হয় সেইটে একবার কল্পনা করো, কেমন মস্ মস্ মুড় মুড় শব্দ করতে থাকে। যে বরফ আমরা ঘোলের সরবতের সঙ্গে খাই এ বরফ তেমন নিরেট নয়। এ বরফ

যখন পড়ে তখন পেঁজা তুলোর মতো খুব আ-স্তে আ-স্তে খুব মোলায়েমভাবে পড়ে, ভোর বেলাকার শিউলি ফুলের মতো নিঃশব্দে। বরফ পড়বার সময় বাইরে বেরিয়ে আরাম আছে, অবশ্য সর্বাঙ্গ গরম পোশাকে মুড়ে, পায়ে ডবল বুট চড়িয়ে এবং মাথায় টুপী পর্‌তে না ভুলে। বৃষ্টিতে তো অনেক ভিজেছ, একবার যদি বরফে ভিজ্‌তে তো জান্‌তে কেমন ফর্তি! তবে মুশকিল এই যে পা পিছলে আছাড় খাবার সম্ভাবনা প্রতি পদেই। এ তো আর জল নয় যে মাটিতে পড়ে স্রোত হয়ে পথ কেটে বয়ে যাবে, দাঁড়াবে না। এ হচ্ছে বরফ, এ যেখানে পড়ে সেখান থেকে নড়বার নাম করে না, যতদিন না সূর্যের উত্তাপ লেগে গলে যায়। ঘরের জানালা খোলা রাখলে আর রক্ষে নেই, রাজ্যের বরফ এসে তোমারি ঘরে জড় হবে, তোমার ঘরে যদি খাবার জল থাকে তো সে জল জমে বরফ হয়ে যাবে, যদি দুধ থাকে তো দুধেরও সেই দশা! ঘরের দরজা জানালা প্রায় সারাক্ষণই বন্ধ রাখতে হয়, অবশ্য বাতাসের জন্যে ফাঁক রেখে। ঘরে সেণ্ট্রাল হীটীংএর ব্যবস্থা থাকে, তার মোটামুটি মানে এই যে ঘরটাকে কৃত্রিম উপায়ে গরম রাখা হয়। বিছানা খুব পুরু করে পাতা দরকার, লেপ কম্বল এক দঙ্গল! ঘরে বসে জানালার কাঁচ দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে পারো—যতদূর চোখ যায় কেবল বরফ আর বরফ। "কোথায় এমন তুষার ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে! ও সে মাটির উপর ঢেউ খেলে যায় বরফ কাহার দেশে!"

সূর্যের আলো যখন সেই বরফের ওপর ঝক্‌ঝক্ করে সাত রঙে বিভক্ত হয়ে যায় আর চাঁদের আলো যখন সেই বরফের ওপর মুক্তোর মতো দাঁত বের করে হাসে, তখন সে যে কী অপূর্ব স্বপ্নের মতো মনে হয়, যেন দুধ-সাগরের কূলে এসে পৌঁছেছি, তার ওপারে রাজকন্যার ঘুমন্ত পুরীর দেউড়ীতে পর্বত পাহারা দিচ্ছে, পর্বতের পাগড়ীতে সাপের মাথার মণির মতো জ্বলছে আকাশের যত তারা! আঁধার রাত্রে সমস্ত খাঁ খাঁ করতে থাকে, আর বরফের ওপরে চোখ ফেললে মনে হয় যেন মড়ার মাথার খুলি। মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে কম্বলের ভিতর থেকে মুখ বের করে তাকাই, আর জানালার সার্শীর ওপারের দৃশ্য চোখে পড়ে যায়। মা গো, সে কী ভয়ানক! কী নিঃঝুম! যেন জ্যৈষ্ঠমাসের দুপুর বেলার রোদ্দুর ডিসেম্বর মাসের রাত্রের বেলা বরফ সেজে এসেছে, যেন দ্বাপর যুগের পুতনা রাক্ষসী শাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে যোজন জুড়ে পড়ে রয়েছে, যেন হাজার হাজার জোনাকী তারার মুখোস পরে অন্ধকারময় উড়ে বেড়াচ্ছে। তক্ষুনি চোখ বুজে মুখের ওপর কম্বল টেনে দিই। তার পরে আবার যখন ঘুম ভাঙে তখন শুয়ে শুয়ে ঘরের আয়নার দিকে চেয়ে দেখি ভোরের সূর্য আকাশ আলো করে পাহাড়ের শিয়রে সোনার কাটি ছুঁইয়ে দিয়ে বলছে —"জাগো।"

তখন দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বোতাম টিপে দিই: দাসীর ঘরে ঘণ্টা বেজে ওঠে, সে গরম জলের পাত্র

নিয়ে দ্বারের ওপাশ থেকে টোকা দিলে ফরাসী ভাষায় বলি "আঁত্রে" (প্রবেশ করতে পারো) ; ঘরে ঢুকে সে বলে "বঁ ঝুর মশিয়ে" (সুপ্রভাত, মহাশয়) ; সে চলে গেলে মুখ ধুই, প্রাতঃকৃত্য করি, তারপর আবার বোতাম টিপলে সে এসে ব্রেকফাস্ট দিয়ে যায়। ব্রেকফাস্ট সাধারণতঃ দুধ, রোল্ (রুটি), মাখন, জ্যাম্। সুইটজারল্যাণ্ডের দুধ খেতে এত সুন্দর, তার একটা নিজস্ব সুগন্ধ আছে যা অন্য কোনো দেশের দুধে নেই, তার রংটিও তার নিজস্ব। আর রোল্ শুক্‌নো অথচ শক্ত নয় ; চিম্‌সে নয়, মুখে দিতে না দিতেই মিলিয়ে যায়, অনেকক্ষণ ধরে চিবোতে হয় না, জ্যাম না মাখালেও মিলিয়ে গিয়ে মিষ্টি লাগে। আর সুইটজারল্যাণ্ডের মাখনটিও খেতে এমন সুন্দর, পারী (Paris)র মাখনের মতো পান্‌সে নয়, লণ্ডনের মাখনের মতো নোন্‌তা নয়, যেন সদ্যপ্রস্তুত টাটকা জিনিস, কৌটায় বন্দী বহুদূর থেকে আনীত নয়। সুইটজারল্যাণ্ডের হাওয়ার প্রভাবে বোধ হয় সব জিনিসই শুষ্কতাপন্ন ; লণ্ডন পারীর হাওয়ার দোষে সব জিনিসই কতকটা স্যাঁতস্যাতে। তফাৎটা যেন ছোটনাগপুরের সঙ্গে বাংলাদেশের তফাৎ।

লণ্ডন থেকে সুইটজারল্যাণ্ডের পশ্চিমপ্রান্ত যেন কলকাতা থেকে কাশী। মাঝখানে ফরাসীদের দেশ ফ্রান্স। সুইটজারল্যাণ্ডে যেতে হলে পারী (Paris) হয়ে যেতে হয়, লণ্ডন থেকে পারী যাবার দু'টো উপায় আছে,

একটা হচ্ছে ট্রেনে করে কিছুদূর স্টীমারে করে কিছুদূর এবং আবার ট্রেনে করে বাকীটা; আরেকটা হচ্ছে এরোপ্লেনে করে সমস্ত পথ। পারী থেকে বরাবর ট্রেন। ইউরোপটা যেন আমাদের ভারতবর্ষেরই মতো, আর ইংলণ্ড যেন আমাদের সিংহল। ভারতবর্ষের আসাম থেকে গুজরাটে যাওয়া আর ইউরোপের স্পেন্ থেকে সুইডেনে যাওয়া একই রকম ব্যাপার—কেবল মাঝে মাঝে শুল্ক বিভাগের আম্লারা এসে বাক্স খুলে দেখে কোনো রকম মাশুল দেবার মতন জিনিস লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছি কি না আর পাস্পোর্ট পরীক্ষা করে দেখে বিদেশে ভ্রমণ কর্বার অনুমতি পেয়েছি কি না। এসব ব্যাপার বড় অপ্রীতিকর, একবার নয় তু'বার নয় চার বার এই হ্যাঙ্গাম। আসাম থেকে গুজরাটে যেতে চাও তো আরামে যেতে পারো, কিন্তু স্পেন থেকে সুইডেনে যেতে চাইলে পাঁচ সাত বার পাস্পোর্ট খুলে দেখাতে হবে, বাক্স খুলে দেখাতে হবে! ঝকমারি! মাশুল দেবার মতন জিনিস সব দেশে এক নয়, ইংলণ্ডে যা স্বচ্ছন্দে আন্তে পারো ফ্রান্সে তা নিতে চাইলে মাশুল দিতে হবে। সুইটজারল্যাণ্ডে যাবার সময় যে কামরাটায় যাচ্ছিলুম সেই কামরাটায় একজনের সঙ্গে কিছু সিগার ছিল, সে সুইস্ সীমান্তে এসে সেগুলোর কিছু নিজের পকেটে কিছু আলাপীদের পকেটে কিছু সীটের নীচে কিছু 'ব্যাঙ্কে'র উপরে চট্পট্ সরিয়ে ফেললে। শুল্ক বিভাগের আমলারা যখন এল তখন সে অম্লান বদনে বললে, 'না,

আমার কাছে নিষিদ্ধ কিছু নেই ;” তারা চলে গেলে আলাপীদের পকেট থেকে সিগারগুলি উদ্ধার করে তাদের এক একটি খাওয়ালে, আর খুব একচোট হেসে নিলে। ফ্রান্সের ইতালীর সুইটজারল্যাণ্ডের লোক খুব আলাপী ও মিশুক প্রকৃতির। ইংরেজরা ওদের মতো ট্রেনে উঠে বক্‌বক্‌ করে না।

সুইটজারলাণ্ডে পৃথিবীর সব দেশের লোক হাওয়া বদ্‌লাতে যায়, যক্ষ্মা রোগ সারাতে যায়, বরফের উপর শী খেল্‌তে স্কেট্‌ কর্‌তে যায়। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ বিদেশী গিয়ে সুইটজারল্যাণ্ডের হাজার হাজার হোটেল দখল করে বসে, তাদের দৌলতে সুইটজারল্যাণ্ডের মতো পাহাড়ী দেশের গরীব অধিবাসীরা বড় মানুষ হয়ে গেল। যেন সারা বৎসর মহোৎসব চলেছে, দীয়তাং আর নীয়তাং, টাকাং দীয়তাং আর সেবাং নীয়তাং।

ব্রেকফাস্টের পরে কী হয় তোমাদের তা বলিনি। ব্রেক্‌ফাস্টের তিন ঘণ্টা পরে লাঞ্চ (মধ্যাহ্ন ভোজন)। ততক্ষণ সবাই নিজের নিজের কাজে বা খেলায় লেগে যায়। বরফ ঢাকা রাস্তার ওপর দিয়ে কেউ বা যায় চাকাবিহীন “শ্লেজ্‌” গাড়ী পিছ্‌লিয়ে, কিংবা চাকাবিহীন “লুজ”-পিঁড়ি পিছ্‌লিয়ে, রাস্তার একপাশ দিয়ে কেউ বা চলে স্নো-বুট পরা পায়ে হেঁটে। বরফ ঢাকা মাঠের ওপরে খেলা জমে—মোচার খোলার মতো এক প্রকার সরঞ্জাম পায়ে বেঁধে শী*

* “Ski”কথাটার উচ্চারণ, “শী”।

খেলা, উল্টোপাল্টা দু'খানা খড়মের মতো একরকম সরঞ্জাম পায়ে পরে স্কেট্ করা। আরো কত রকম খেলা আছে। ইউরোপের খোকাখুকী থেকে বুড়োবুড়ি পর্যন্ত সবাই খেলোয়াড়। আমার পাঁসিঅঁতে* দু'টি আমেরিকান মেয়ে ছিল, ওরা একা একা আমেরিকা থেকে জাহাজে চড়ে এসেছে, এসে ওদের মা'র সঙ্গে যোগ দিয়েছে, ওরা রোজ যেত শী খেল্‌তে বা স্কেট্ কর্‌তে, পুরুষের মতো খেলার পোশাক পরে। শুধু আমেরিকান কেন, সব দেশের মানুষ সুইটজারল্যাণ্ডে দেখা যায়। আমার পাঁসিঅঁতে যারা থাক্‌ত তাদের সঙ্গে দেখা হতো লাঞ্চ খাবার ও ডিনার খাবার ঘরে। ডিনার মানে রাত্রি ভোজন। তারপরেও কেউ কেউ সাপার খায়, কিন্তু সাধারণের পক্ষে ডিনারই শেষ খাওয়া। এক টেবিলে বসে অনেক জন মিলে লাঞ্চ বা ডিনার খায়, নানা দেশের লোক, জার্মান ফরাসী ইংরেজ ইতালীয়ান চেক্ হাঙ্গেরিয়ান ইত্যাদি। ভারতবর্ষের সব প্রদেশের লোক কোনো দিন এক সঙ্গে খায় কি? তোমরা কি তোমাদের স্বদেশবাসী কানাড়ী মলয়ালী সিন্ধী নেপালীদের সঙ্গে বসে খেতে পাও! কিংবা তোমাদের আপন প্রদেশের বেনে বাগ্দী নমঃশূদ্রদের সঙ্গে সামাজিক ভোজে যোগ দিতে পাও? ইউরোপের লোক এক হবার যত সুযোগ পায় আমরা তত পাইনে।

* "Pension" কথাটার উচ্চারণ, "পাঁসিঅঁ।" ওর মানে, একটু ঘরোয়া ধরণের হোটেল।

লাঞ্চের পর আমরা পাহাড়ের উপর উঠে বনের ভিতর দিয়ে বরফের ওপর আছাড় খেতে খেতে অন্য গ্রামে বেড়িয়ে আস্‌তুম। আমি যে গ্রামটাতে ছিলুম সেটার নাম লেজ্যাঁ। ইউরোপের গ্রামগুলো শহরগুলোর চেয়েও আরামের। শহরের সব সুবিধাই গ্রামে আছে। বেড়াতে বেড়াতে তেষ্টা পেলে কাফেতে বসে কাফীর ফরমাস করো, কাফীতে চুমুক দিতে দিতে তু'ঘণ্টা বসে থাক্‌লেও কেউ কিছু বল্‌বে না। কাফেটা হচ্ছে সাধারণ লোকের ক্লাবের মতো, সেখানে গিয়ে যতক্ষণ খুশি আড্ডা দাও, বই পড়ো, তাস খেলো, কাফীর জন্যে তু'চার আনা পয়সা ধরে দিলেই সাত খুন মাপ! চাষী মজুরেরাও দিনের কাজের শেষে খেয়ে দেয়ে কাফেতে গিয়ে মদের গ্লাস নিয়ে বসে, তাদের অবশ্য স্বতন্ত্র কাফে। ছাত্রেরা কাফেতে গিয়ে কাফীর পেয়ালার সাম্‌নে পাঠ্যপুস্তক খুলে বসে, তাদেরও তেমনি নিজেদের পৃষ্ঠপোষিত কাফে। কাফেতে নাচ গানও হয়।

এতক্ষণ তোমাদের শুধু খেলার দিকটা দেখিয়েছি, কাজের দিকটা দেখাইনি। দারুণ শীতের মধ্যেও মজুরেরা মাটি খুঁড়ছে, চাষারা চাষ কর্‌ছে, দোকানীরা দোকান চালাচ্ছে। কাজের সময় অবিশ্রান্ত কাজ, খেলার সময় অবিশ্রান্ত খেলা। আমাদের সেই পাঁসিওঁর দাসীটি ভোর থেকে মাঝ রাত অবধি কত রকমের কত খাটুনি যে খাটত দেখে অবাক হয়ে যেতুম, অথচ তার মুখে কথা নেই, বিরক্তির চিহ্ন নেই, হাসি লেগে রয়েছে। লেজ্যাঁতে

লেজাঁ (Leysin)
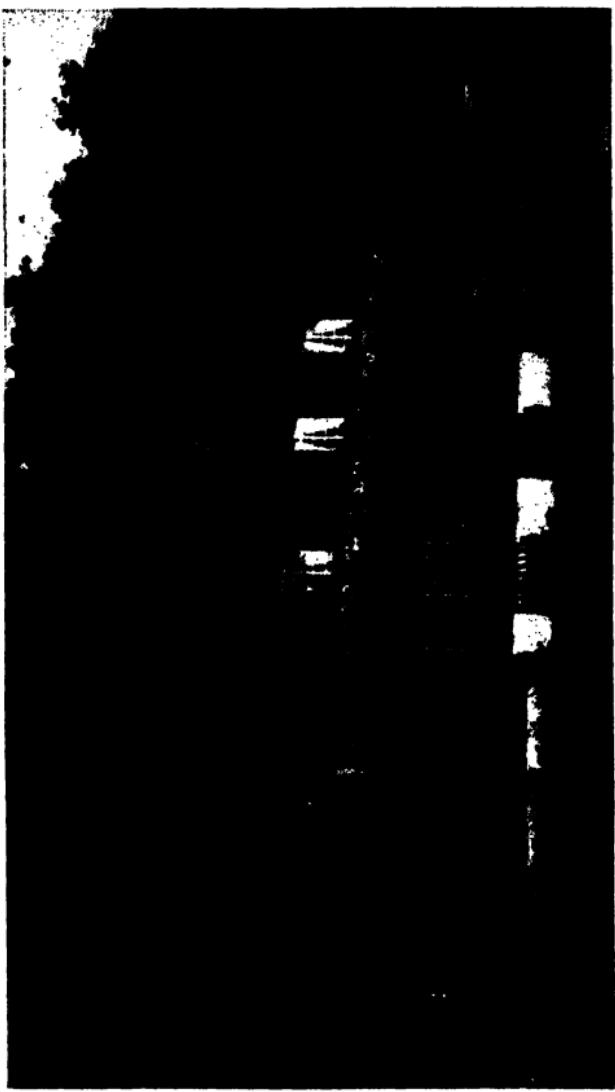
শালে (Chalet)

যক্ষ্মারোগীদের যে সব ক্লিনিক আছে সেগুলিতে যে সব রোগী তিন বছর একই ভঙ্গীতে শয্যাশায়ী ভাবে পড়ে আছে, তাদের দেখলে মনে হয় না যে তারা একটুও দুঃখিত বা চিন্তিত। জীবনটাকে খুব হাল্‌কা ভাবেই ওরা নিচ্ছে, যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ। কয়েকটি ক্লিনিকে যক্ষ্মা রোগী ছেলেমেয়েরা শয্যাশায়ী। নানা দেশের ছেলেমেয়ে— ফিন্‌ল্যাণ্ড্ থেকে পর্ত্তুগাল অবধি ইউরোপের মানচিত্রে যতগুলো দেশ দেখ্‌ছ সব দেশের বালক বা বালিকা প্রতিনিধিরা সেখানে একজোট হয়েছে, এদের দিয়ে নতুন ইউরোপ এক হয়ে গড়ে উঠেছে। সুইটজারল্যাণ্ডে রুগ্‌ণ ছেলে মেয়েদের জন্যে আন্তর্জাতিক স্কুল আছে, সূর্যালোক ও মুক্ত বাতাসের মধ্যে তারা স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাও লাভ করে। ইউরোপের ইস্কুলগুলিতে লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজও শেখানো হয়, ড্রিল ইত্যাদি কসরৎ তো শেখানো হয়ই, গানের সাহায্যে বাজনার সাহায্যে নাচের সাহায্যে খুব লোভনীয় ভাবে শেখানো হয়। সেইজন্যে ইউরোপের ইস্কুলকে পাঠশালা বললে তার ঠিক পরিচয়টি দেওয়া হয় না, পাঠশালা তো বটেই নাটশালাও বটে, আবার কারু-শিল্পের কারখানাও বটে। ছেলেরা বাড়ীতে পড়ে না, যতটুকু পড়বার ততটুকু ইস্কুলে গিয়ে পড়ে। ছেলেরা তবেই মুখস্থ করবার যন্ত্র নয় যে সকাল দুপুর সন্ধ্যা কেবল ঐ কর্মই করবে! খেলাও ওদের একটা কর্ম, ওদের বয়সে খেলাটাই বরং মুখ্য পড়াটা হচ্ছে গৌণ।

সুইটজারল্যাণ্ড থেকে ফেরবার পথে একটি ইংরেজ বালকের সঙ্গে দেখা। সুইটজারল্যাণ্ডে স্কী খেলতে স্কেট্ করতে গিয়েছিল, সুইটজারল্যাণ্ডটা হচ্ছে ইউরোপের play-ground, বিশেষতঃ শীতকালে। ডোভারে ট্রেনে ওঠ্‌বার পর তার সঙ্গে আলাপ। বললে, "চা খেয়েছেন? চা আনতে দেবো?" বললুম—"এই মাত্র খেয়ে এলুম, ধন্যবাদ।" সে ট্রেনের দেয়ালের বোতাম টিপতেই রেস্তঁরা কারের ওয়েটার এল, তাকে নিজের জন্য চায়ের ফরমাস দিলে। ইতিমধ্যে এক ফরাসী যুবক এসে জিজ্ঞাসা করেছেন, "জায়গা হবে কি?" আমরা বলেছি, "ঠিক একটি জায়গা খালি আছে, আপনাকে নিয়ে আমরা তিনজন হবো!" ফরাসীটি এসে বস্‌বামাত্র তাঁকেও জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "চা খেয়েছেন? আন্‌তে দেবো?" তাঁর সম্মতি নিয়ে তার জন্যে চা আন্‌তে দিলে, কিন্তু চা আর আসে না! নিজের চা'টা ভদ্রলোককে খেতে অনুরোধ করে সে একখানা বই খুলে পড়্‌তে আরম্ভ করে দিলে। অনেক দেরিতে চা যখন এল তখন নিজের টোস্ট নিয়ে তাঁকে খাওয়ালে। তারপর তিন জন মিলে গল্প। ছেলেটি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে অনেক খবর জানতে চাইলে; জানালুম কিন্তু শেষকালে আমাকে বললে, "আপনি আমাকে নিরাশ করলেন, আমি ভেবেছিলুম আপনি যখন ভারতবর্ষের লোক তখন কিছু না হোক দু'চারটে ভেল্কি ভোজবাজি বল্‌বা মাত্রই দেখাবেন। কিন্তু আপনি বল্‌ছেন ও সব কিছু জানেনই না; যদিও ইস্কুলে আমরা পড়েছি

আপনারা জানেন।” অগত্যা সে নিজেই আমাকে একটা সস্তা বিলিতী মজলিসী খেলা শিখিয়ে দিলে, কাগজে কলমে নক্সা কেটে খেল্‌তেহ য়। ফরাসীটিও দেশলাইয়ের ওপর দেশলাইয়ের কাটি সাজিয়ে কী একটা কৌশল শেখাতে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে ট্রেন এসে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে থামল।

লণ্ডন, ২৩ ফাল্গুন ১৩৩৪

আইল অফ্ ওয়াইট

ইংলণ্ডের দক্ষিণে এই যে দ্বীপটি এটি আমাদের যে কোনো মহকুমার চেয়েও বোধ হয় ছোট ; কিন্তু তোমাদের ক'জনই বা নিজের নিজের মহকুমা বা জেলা মোটামুটি রকম দেখেছ ? এরা কিন্তু এরোপ্লেনেও যেমন ওড়ে পায়েও তেমনি হাঁটে। আমি এই চিঠি লিখছি আর আমার কাছে একটি ছোকরা বসে আগুন পোহাতে পোহাতে বই পড়্ছে ; সে লণ্ডন থেকে ব্রাইটন ৫২ মাইল ৮ ঘণ্টায় হেঁটে এসেছে, সে রাস্তাও আমাদের রাস্তার মতো সমতল নয়, পাহাড়ে। ব্রাইটন থেকে এখানে জাহাজে ক'রে আসা যায়, কিংবা রেলে করে পোর্টস্মাথে এসে সেখান থেকে জাহাজে করে এখানে আসা যায়। আমি লণ্ডন থেকে পোর্টস্মাথ্ রেলে এলুম, তারপর জাহাজে চড়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে এখানে পৌছলুম। এই দ্বীপটার আগাগোড়া রেল আছে, বাস আছে, জাহাজ আছে, ট্যাক্সি আছে, ঘোড়ার গাড়ী আছে, পায়ে হেঁটে সমস্ত দ্বীপটা দেখতেও বেশী সময় লাগে না। দ্বীপটাতে গোটা পাঁচ ছয় শহর আছে, সেখানে গ্রীষ্মকালে লোকে হাওয়া বদল করতে আসে। খুব ছোট ছোট শহর, কিন্তু চমৎকার পরিপাটী। রাস্তাঘাট ফিটফাট, বাড়ীঘর সারিবদ্ধ, দোকানে বাজারে ইংরেজসুলভ শৃঙ্খলা, কোনো রকম হট্টগোল, কোনো রকম দরকষাকষি কোনো রকম

ফেলাছড়া নেই। মেজের ওপরে হাঁটু গেড়ে ইংরেজ মেয়ে মেজে-দেয়াল নিকিয়ে চক্‌চকে কর্‌ছে, এমন দৃশ্য প্রতিদিন সকালবেলা দেখি। ঘরসাজানো জিনিসটি ইংরেজেরা যেমন বোঝে আমরা তেমন বুঝিনে। প্রত্যেকটি আস্‌বাবের নির্দিষ্ট স্থান আছে, একস্থানে কিছুই জড় করা হয় না, নির্দিষ্ট স্থান থেকে কোনো জিনিস এক ইঞ্চি সরে না। যেমন ঘরে তেমনি বাইরে। আমাদের ভালো ছেলেরা আঙুলে কালি মেখে চুল ঝোড়োকাকের মতো করে জামার আস্তিন খোলা রেখে চটি ফট্‌ফট কর্‌তে কর্‌তে হাঁটেন, অথচ তাঁদের মা-বোনদের এদিকে নজর দেবার ফুরসৎ থাকে না এবং তাঁদের বাপখুড়োদের মতে এই তো সুবোধ ছেলের লক্ষণ। ছেলে আমার লেখাপড়া ছাড়া আর কিছুতে মন দেয় না, এ কি কম সৌভাগ্য? ইংরেজ ছেলেদের মায়েরা কিন্তু অতি অল্প বয়স থেকে ছেলেকে ফিটফাট হতে শেখান, সেই জন্যে হাতমুখ ধুয়ে মুছে মেজে ধবধবে তক্‌তকে রাখাটা ভালো ছেলের পক্ষে লজ্জার কথা নয়, চুলে চিরুনী দিয়ে ব্রাশ লাগিয়ে ভদ্রগোছের একটা অতি সাদাসিধে টেড়ী কাটা স্বয়ং পণ্ডিত মশাইয়েরও নিত্যকর্মের অঙ্গ এবং খুব অল্পদামের পোশাকও নিজের হাতে ঝেড়ে কেচে পরিষ্কার রাখা সম্ভব।

এই বাড়ীতে একটি ছোট ছেলে তার বাবার সঙ্গে এসেছে; তার বাবার সঙ্গে তার যে রকম সম্বন্ধ তাকে আমরা বলতুম—"দোস্তি"। এরা যেন দুটি বন্ধু ইয়ার, পরস্পরের সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌তে এদের একটুও বাধে না,

পরস্পরের সঙ্গে খেলা করা তো তবু ভালো, পরস্পরের সঙ্গে বক্সিং লড়াটাও মাঝে মাঝে চলে! বাপ ছেলেকে "Wild flowers" নামক একখানা উদ্ভিদ্‌বিদ্যার বই উপহার দিয়ে তার ওপরে লিখেছেন "To Roy—Dad"। ছেলেটির নাম Roy. আমি এই চিঠি লিখছি, Roy পিয়ানো বাজাচ্ছে, তার বাবা এলেন। Roy বললে, "বাবা, তোমাকে কত খুঁজলুম, তুমি কোথায় গিয়েছিলে!" বাবা বললেন, "বাগানে ছিলুম।" ছেলে বাবার কাছে গিয়ে আনন্দে লাফ দিলে যেমন পোষা কুকুরে লাফায়; তারপর আবার গিয়ে পিয়ানোয় বসল, তার বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছেন। তার বাবা তাকে কোনো বিষয়ে নিরুৎসাহিত করেন না। তার দস্যিপানায় তিনি তার সর্বপ্রধান সাথী, দুরন্তপনায় তিনিই তার ওস্তাদ্।

সেদিন সকালবেলা আমি ব্রেক্‌ফাস্ট খেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি, এমন সময় পেছন ফিরে দেখি একখানা ঘোড়ায়-টানা cart আস্‌ছে, আমাদের দেশের মোষে টানা গাড়ীর মতো মাল-বোঝাই। গাড়ীটা আমার কাছে এসে থাম্‌ল। গাড়ীর চালক আমাকে বললে, "গাড়ীতে বস্‌বেন?" আমি বললুম, "বেশ তো।" তখন তার পাশে গিয়ে বস্‌লুম। সে বললে, "কোথায় যাওয়া হচ্ছিল! Sandown?" আমি বললুম, "কোথায় যাবো ঠিক্ না করে বেরিয়েছি—পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।" সে বললে, "আসুন তবে Sandown ঘুরে আস্‌বেন, বেশি দূর না, লাঞ্চের আগেই ফিরতে পারবেন।" তারপরে যা ঘটল তার বিবরণ দিতে

বস্‌লে একখানা মহাভারত লেখা হয়ে যায়। সুতরাং সংক্ষেপে সারি। সে দিন বাসায় ফিরে লাঞ্চ খাওয়া তো ঘটলই না, বাসায় ফিরে চা খাওয়াও ঘটল না, এবং ডিনারের জন্যে ফিরতে দিতেও তার ইচ্ছা ছিল না। সে আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে লাঞ্চের সময় lobster খাওয়ালে, তার এক বন্ধুর বাড়ীতে চায়ের সময় কাঁকড়া খাওয়ালে এবং সারাদিন ধরে গাড়ীতে করে অনেক গ্রাম ও শহর তো দেখালেই, শেষকালে বাসায় এনে পৌঁছে দিলে। লোকটা হচ্ছে তার নিজের কথায় "fisherman by trade", তার বয়স ৬৬ বৎসর, গায়ে ভীমের মতো জোর, বক্সিংএ নাকি এ দ্বীপের তার দোসর নেই। যুদ্ধের সময় submarine-এর ওপর নজর রাখবার জন্যে যেসব জাহাজ ছিল তাদের একটাতে সে কাজ করত। এই দ্বীপেই তার জন্ম, এইখানেই সে অধিকাংশ জীবন কাটিয়েছে এবং এখনো তার ইচ্ছা আছে নানা দেশ ঘুরে আস্‌বে, India দেখে আস্‌বে। সে জিজ্ঞাসা করলে, "India কত বড়? লণ্ডনের চেয়েও বড়!" তার জিওগ্রাফীর দৌড় লণ্ডন অবধি।

তার সঙ্গে Sandown গেলুম। রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হয় সেই সেলাম করে। পাড়াগাঁয়ের লোক নতুন লোক দেখলেই শ্রদ্ধা জানায়। সুইটজারল্যাণ্ডের চাষারা রাস্তায় সেলাম করে বলেছে, "Bon jour, monsieur," এখানকার গেঁয়ো লোকেরাও দেখা হলেই বলে, "Good morning, Sir!" লণ্ডনের মতো শহর জায়গায় নতুন লোকের সম্মান

নেই, কারণ সেখানে তো নতুন লোকের ছড়াছড়ি। রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হয় টেরি তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয়, জুড়ে দিয়ে শেষকালে বলে—"এই ছেলেটি এ অঞ্চলে নতুন এসেছে, একে দেশ দেখাতে নিয়ে চলেছি।" টেরির ইচ্ছাটা এই যে আমি যেন জানি, টেরি এ দ্বীপের একটা মাতব্বর লোক, সকলে তাকে চেনে ও ভলোবাসে। "They all like me—don't they ?" কথায় কথায় আমার ওপরে এই প্রশ্নবাণ। "They all know me—I am known all over the Island—am I not ?" আমি অগত্যা বলি, "তা তো দেখ্‌ছি।" তখন সে বলে, "When you go back to India, tell your father that you met Terry Kemp, the fisherman." সে বেচারা জানে না যে India এখান থেকে আট হাজার মাইল দূরে, সে ভাবছে India বোধ হয় ফ্রান্সের মতো কাছাকাছি।

টেরির সঙ্গে সেদিন সমস্ত দিন বকেছি, কিন্তু ঐ একই কথা। "Isn't that a good pony ?" আমি বলি, "Certainly," "Isn't that a lovely dog ?" "Oh, yes." মোট কথা টেরির যা কিছু সমস্ত ভালো। তার ঘোড়ার মতো ঘোড়া এ দ্বীপে নেই, তার কুকুরের মতো কুকুর এ দ্বীপে নেই। তার বাড়ী নিয়ে গিয়ে দেখালে তার মোটর বোট্, তার ছোট ছোট নৌকা, তার ভাড়া দেবার চেয়ার, তার মুরগীর পাল—তার সমস্ত কিছু নতুন লোকের দেখ্‌বার মতো এবং বাবাকে লেখবার মতো।

"Well, you like it. Then write that to your father." আমার বাবার প্রতি তার এই আকর্ষণটা বড়ই অযাচিত। আমার বাবার বয়স কত, তাঁর ক'টি ছেলেমেয়ে, তিনি কবে ইংলণ্ডে আস্‌বেন, ইত্যাদি ঘরোয়া প্রশ্নের কথা তোমাদের নাই জানালুম। তোমরা শুধু জেনো, পাড়াগাঁয়ের লোক সব দেশেই সমান, সব দেশেই এদের স্নেহ মমতা বেশী, অতি সহজে এরা মানুষকে আপন করে নেয়, বিদেশী লোককে সাহায্য কর্‌তে পার্‌লে এরা কৃতার্থ হয়ে যায়। তবে গ্রামের মধ্যে এরাই যে মাতব্বর লোক, এদের যা আছে আর কারো যে তা নেই, এ কথাটা এরা পদে পদে জানিয়ে রাখে এবং কেবল তুমি জানলে হবে না তোমার বংশসুদ্ধকে জানিয়ে দেওয়া চাই।

টেরির বাড়ী হয়ে Shanklin দেখতে এলুম। Shanklin বড় সুন্দর শহর। পাহাড় কেটে সমুদ্রের বাঁধ করা হয়েছে, যেন দেয়ালের মতো সোজা হয়ে উঠেছে। অনেক উঁচুতে বাঁধের ওপরে বড় বড় সব হোটেল কাফে সিনেমা নাচঘর। টেরি ওখান থেকে গাড়ী বোঝাই করে কাঁকড়া ও lobster সংগ্রহ কর্‌লে, ওসব সিদ্ধ করে অন্যত্র বিক্রী করে মুনাফা পাবে। Shanklin থেকে ফেরবার সময় দৈবাৎ তিনটি ভারতীয় তরুণীর সঙ্গে দেখা। ভদ্রতার ধার না ধেরে টেরি কর্‌লে কি না, আমার মত না নিয়ে তাঁদের ডেকে বললে, "Ladies, here is a gentleman wishing to meet you." আমি অগত্যা নেমে পড়ে

২

তাঁদের সঙ্গে দু'একটা শিষ্ট কথা বিনিময় করলুম। টেরির আলায় শেষটা আমার দশা এমন হয়েছিল যে, মনে মনে বলতে লাগলুম, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। রাজ্যিসুদ্ধ সকলের সঙ্গে তার ভাব, সকলের সঙ্গে তার ঠাট্টা। এক তরুণ তার তরুণীকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে ফিরছে —টেরি তাকে বললে, "কি হে তুমি তোমার মেরীকে নিয়ে বেড়াচ্ছ বুঝি, আমাদেরও দিনকাল ছিল হে, আমাদেরও মেরী ছিল"—বুড়োর রসিকতায় তরুণীটির মুখ এমন রাঙা হয়ে উঠল আর তরুণটির হাসি এমন সঙ্কোচসূচক হলো যে, আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। অথচ এ ধরণের রসিকতা তো এই নতুন দেখলুম না, দেশেও দেখেছি পাড়া-গাঁয়। এটা তাজা মনের,সুস্থ মনের লক্ষণ। দোষের মধ্যে এটা একটু ভোঁতা, একটু স্থুল।

তারপরেও এ রকম রসিকতা পদে পদেই চলল। পথে তরুণী দেখলেই বৃদ্ধের ঠাট্টা শুরু হয়। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, "এমন girls তোমার দেশে আছে?" কী আপদ্! আমি বলি, "হুঁ।" এর পরে টেরির বাড়ী এসে lobster সিদ্ধ করলুম তার সঙ্গে মিলে। তার মতো লোকের বাড়ীতেও কলের উনুন আছে, পয়সা ফেললেই গ্যাসের আগুন জ্বলে। ইউরোপের গরীব লোকেরাও খুব আরামে থাকে। তাদেরও স্বতন্ত্র বসবার ঘর, শোবার ঘর, রান্নাঘর, স্নানের ঘর—সাজ-সজ্জা বেশ ভালোই। তবে টেরির বাড়ীটা কিছু নোংরা ও এলোমেলো। কারণ টেরির বুড়ী মারা গেছে, ছেলে মারা

গেছে। টেরি কোথায় খায়, কোথায় শোয়, তার ঠিক্ থাকে না, সে মাছ-কাঁকড়া ধরে ও বিক্রী করে গ্রামে গ্রামে বেড়ায়।

Lobster সিদ্ধ করতে বেশ সময় লাগে! কতগুলো জ্যান্ত lobster ডেক্‌চীতে করে উনুনে চড়িয়ে দিয়ে আমরা চা খেতে বসলুম। Lobsterগুলো সিদ্ধ হলে পর জ্যান্ত কাঁকড়া সিদ্ধ করার পালা। সে গেল ঘোড়াকে hay ঘাস খাওয়াতে, আমি রইলুম কাঁকড়ার তদ্বির করতে। কাঁকড়াও সিদ্ধ করতে সময় লাগে অনেক। কাঁক্‌ড়াগুলো সঙ্গে নিয়ে ৬ লবস্টার খেয়ে আমরা বেরুলুম সেণ্ট হেলেন্স গ্রামের পথে রাইডের অভিমুখে।

পথে এক কৃষকের বাড়ী থেমে দেখলুম কৃষক কোথায় গেছে, কেউ নেই বাড়ীতে। কৃষকের অনেকগুলি মুরগী আর গোরু আছে, আর তার পুকুরে অনেকগুলি হাঁস সাঁতার কাটছে। মুরগী এদেশে সব গ্রাম্যলোকেই রাখে, তাতে খরচ কম, লাভ অনেক। আর একজন কৃষকের বাড়ী গেলুম, সে গরীব বলে তাকে টেরি গোটাকয়েক কমলালেবু দিলে, দয়া করে নিজের ইচ্ছায়। তার ছেলেমেয়েগুলি ঘরের জানালার ওপার থেকে হাত নেড়ে আমাকে ভালোবাসা জানাতে লাগল। টেরি একটি ফুল তুলে এনে আমাকে পরিয়ে দিয়ে গাড়ী চালাতে যাচ্ছে এমন সময় একটা মোটর কার কোত্থেকে ছুটে এসে বেচারি নেলী কুকুরটিকে মাড়িয়ে দিয়ে গেল। সৌভাগ্যক্রমে নেলী প্রাণে মরল না, কিন্তু তার

মাথার এক জায়গা বিষম কেটে গেল। টেরি তো কিছুক্ষণ একেবারে থ' হয়ে রইল ; বেচারার রসিকতা গেল কোথায়, কুকুরটিকে তুলে নিয়ে ঐ কৃষকের বাড়ী রেখে এসে সারাটা পথ কাঁদো কাঁদো ভাবে বক্‌তে লাগ্‌ল, "আমার কত সাধের কুকুর, তাকে আমি ৫ পাউণ্ড দামেও বেচতে চাইনি, তাকে কি না মাড়িয়ে দিয়ে গেল ঐ bloody মোটরকার! ইচ্ছা করলে কি থাম্‌তে পারত না? ড্রাইভার ব্যাটার কি চোখ নেই? মজা বের করে দিচ্ছি রোসো। আমি চিনেছি ঐ ড্রাইভারটা কে।"—তারপর ওর নামধাম বংশপরিচয় দেওয়া চল্‌ল আর মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হতে লাগল, "ইচ্ছা করলেই সে থামতে পারত। না?" আমার মনটাও বিস্বাদ হয়ে গেছল। নেলীটি বড় নিরীহ কুকুর, বেচারি গাড়ীর আগে আগে সারাদিন ছুটেছে, চোখের সাম্‌নে কিনা তার এই দশা ঘটল। ভাবলুম, মানুষ কত সহজে বাঁধা পড়ে। যে মানুষের স্ত্রী মরেছে, ছেলে মরেছে, সে একটা কুকুরকে ছাড়তে পারে না, এত মমতা!

সমস্ত পথ টেরি মন খারাপ করে রইল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, "তোমাকে একটা লব্‌স্টার দিয়েছিলুম বাসায় নিয়ে গিয়ে সকলকে দেখিয়ে খেতে, আন্‌তে ভুলে যাওনি তো সেটা?" আমি বললুম "সেটা একটি ছোট ছেলেকে দিয়ে দিয়েছি।" "দিয়ে দিয়েছ—? তোমাকে খেতে দিলুম শখ করে আর তুমি করলে বিতরণ! নাম করো দেখি কোন ছেলেটাকে দিয়েছ, দেখে নেবো একবার তাকে।" আমি

ভয়ে ভয়ে বললুম, "আহা, রাগ করছ কেন? তোমার এমন সুন্দর লব্‌স্টার একলা আমি খেলে কি ভালো হতো, অনেক জন খেয়ে তোমার সুখ্যাতি করবে এ কি তুমি চাও না?" কিন্তু যুক্তিটা তার মনঃপূত হ'লো না—গাঁয়ো যোগীকে ভিখ্ দিতে তার ইচ্ছা ছিল না। কিম্বা সেই দিত, আমি দেবার কে? ভাবটা বুঝে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "হাঁ, টেরি, তুমি কোন Clubএ যাও?" টেরি উল্‌টো বুঝ্‌লে। বল্‌লে "কী বল্‌ছ? আমি crab রাঁধতে জানি কি না? আচ্ছা তোমাকে একটা crab (কাঁক্‌ড়া) dress করে খাওয়াচ্ছি, দাঁড়াও।"

তখন এক মাঝির বাড়ী আমরা থামলুম। মাঝি তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে চায়ের টেবিলে বসেছিল, আমাকে বসিয়ে চা খাওয়ালে। মাঝির সাত ছেলে দুই মেয়ে—স্ত্রী নেই। ছেলেগুলি মাঝির নিজের কাছে মাঝিগিরির এ্যাপ্রেন্টিস্। তারা খাসা ছেলে, বেশভূষায় ভদ্র ঘরের ছেলের মতন, লেখাপড়া জানে, খবরের কাগজ পড়ে। ছোট খুকীটি বড় লাজুক, তাকে আমি কিছুতেই কথা কওয়াতে পার্‌লুম না। সকলের খাওয়া হয়ে গেছে, তার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, তবু সে লজ্জায় খাচ্ছে না; শেষে আমি তার দিকে না তাকিয়ে মাঝির সঙ্গে কথা জুড়ে দিলুম, তখন খুকী তার চা-টুকু লুকিয়ে এক চুমুকে শেষ করে দিলে।

এতক্ষণ টেরি বসে কাঁক্‌ড়া dress করছিল। Dress করা কাঁকড়া এনে আমার সামনে রেখে বললে, "খাও।"

সর্ব্বনাশ! তার বাড়ীতে সে আমাকে পেট ভরে খাইয়েছে, শুধু চা'ই খাইয়েছে পাঁচ পেয়ালা, যদিও চা আমি কদাচ খাই। এই আমার ভাগ্য যে, টেরি আমাকে কিছুতেই সিগারেট খাওয়াতে পারেনি এবং মদ সে নিজেই খায় না। আগে নাকি খেত, তারপরে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু বড় বেশী সিগারেট খায়। তাকে এক বাক্স সিগারেট কিনে দিলুম। আর দেশলাই তার কিছুতেই জোটে না। রাস্তায় একে তাকে থামিয়ে তাদের দেশলাই চেয়ে নিয়ে সিগারেট ধরায়। লোকটা দিব্যি দু'পয়সা রোজগার করে, তার বিশখানা আন্দাজ নৌকা আছে, শ'খানেক চেয়ার ভাড়া দেয়, কেউ নেই যে কারুর পেছনে খরচ করবে—তবু তার হাতে টাকা নেই, এমন দিন গেছে যেদিন তার হাতে এক পেনীও ছিল না। আসল কথা লোকটা তার যন্ত্রপাতির যত্ন নেয়, পাঁচ বারের পুরোনো নৌকাকেও নতুনের মতো করে রেখেছে, তার পোনী ঘোড়াগুলোর পেছনে খরচ যত করে তাদের কাছ থেকে কাজ পায় না তত।

রাইড, ১৮ই চৈত্র ১৩৩৪

ছেলেমেয়েদের থিয়েটার

"Children's Theatre" নামে লণ্ডনে একটি ছোট্ট থিয়েটার আছে, কাল গিয়েছিলুম তার অভিনয় দেখ্‌তে। থিয়েটারটি লণ্ডনের Shaftesbury Avenueতে, ঐ রাস্তাটায় আরো অনেক থিয়েটার আছে, বড় বড় নামজাদা থিয়েটার। এই অঞ্চলটাকে বলা হয় London's Theatre-land অর্থাৎ লণ্ডন শহরের থিয়েটার পাড়া। কেবল থিয়েটার কেন, আরো অনেক রকম আমোদ প্রমোদের আয়োজন এই অঞ্চলে আছে, বড় বড় সিনেমা, নাচঘর, আর্ট্‌ গ্যালারী, মিউজিয়াম, হোটেল, রেস্তরাঁ, সুইমিং বাথ্‌ সবই এর কাছাকাছি।

আমাদের "Children's Theatre"টি ঠিক Avenueর ওপরে নয়, একটি গলির ভিতরে। প্রবেশ করবা মাত্র চোখে পড়ে। ঘরটি ছোট, শ'খানেকের বেশী সীট্‌ নেই, সব সীট্‌ স্টেজের সাম্‌নের মেজেতে। লণ্ডনের বড় বড় থিয়েটার-গুলোতে তলে ওপরে মিলিয়ে বস্‌বার কায়দা অনেক রকম, বস্‌বার মঞ্চ চার পাঁচ তলা। তাদের বলে সার্কল্‌, স্টল, পিট্‌, ব্যাল্‌কনী, গ্যালারী ইত্যাদি। টিকিট কেন্‌বার সময় ফার্স্ট সেকেণ্ড থার্ড ক্লাস্‌ বললে টিকিট পাবে না, বল্‌তে হবে "ড্রেস্‌ সার্কল্‌" বা "য়্যাম্ফিথিয়েটার স্টল্‌" বা এমনি কোনো কথা। কিন্তু "Children's Theatre"এ ওসব বালাই নেই, ওখানে গিয়ে বল্‌তে হয় আমি এত খরচ করতে রাজি, এই দামের

একখানা টিকিট দিন্। তখন যিনি টিকিট বিক্রী করেন তিনি সেই দামের টিকিট না থাক্‌লে তার চেয়ে একটু বেশী দামের টিকিট কিন্‌তে পারো কিনা জিজ্ঞাসা করেন ও আপত্তি না থক্‌লে দেন। টিকিট্ নিয়ে যেই ভিতরে ঢুক্‌লে অমনি তোমাকে একজন কর্মচারিণী তোমার টিকিটের গায়ে লেখা সীটে নিয়ে বসিয়ে দিলেন ও তুমি দুই পেনী দাম দিলে একখানা প্রোগ্রাম দিলেন। বল্‌তে ভুলে গেছি টিকিটের দাম বড়দের পক্ষে ছয় পেনী থেকে পৌনে ছয় শিলিং অবধি (অর্থাৎ পাঁচ আনা থেকে সাড়ে তিন টাকা অবধি), ছোটদের পক্ষে তার অর্ধেক।

আমার সীটে গিয়ে বস্‌লুম। এ পাশ ও পাশ চেয়ে দেখি বুড়োবুড়ীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়, ছেলেমেয়ে আর বুড়োবুড়ী যেন দশ আনা ছয় আনা। তোমরা ভাব্‌ছ ছোটদের থিয়েটারে বড়রা কী দেখ্‌তে যায়। বড়রা দেখতে যায় ছোটদের আনন্দ। এতগুলি ছোট ছেলে মেয়েতে মিলে যখন মৃদু কণ্ঠে কলরব করছিল, বারবার উঠ্‌ছিল বস্‌ছিল, নিজের সীট্ ছেড়ে পরের সীটে যাচ্ছিল, ও শেষের সারিতে যারা ছিল তারা সীটের ওপর দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিল—তখন তাদের সেই উন্মনা চঞ্চল ভাব বড়দের কত আনন্দ দিচ্ছিল তা কি তারা জান্‌ত? মেরী যখন তার সীট ছেড়ে আগের সারির একটা রিজার্ভ সীট দখল করে বস্‌ল তখন পেছন থেকে তার বাবা ডাক্‌লেন—"মেরী!" মেরী কি শুন্‌ল? মেরীর তখন কত আগ্রহ! কিন্তু রিজার্ভ সীটে

প্রাচীন সজ্জায় সুইস বালকবালিকা

ছেলেমেয়েদের থিয়েটার—রাজা আলফ্রেড্

যখন এক পঞ্চাশ বছরের ঠাকুমা এসে বস্‌লেন তখন বেচারি মেরীকে পুনর্মূষিক হতেই হলো।

এই থিয়েটারটি যেন একটি ঘরোয়া ব্যাপার। অরকেস্ট্রা ছিল না, ছিল একটি পিয়ানো। যিনি পিয়ানোতে বসেছিলেন তিনি বাজাতে বাজাতে যখন থামেন তখন তাঁর একটু দূরে বসে থাকা খোকাখুকুদের আদর করেন। স্টেজটিও ছোট্ট দর্শকদের খুবই কাছে, যাঁরা অভিনয় করছিলেন তাঁরা যেন দর্শকদেরই দলের লোক, তাঁদের সঙ্গে আমাদের নিকট সম্বন্ধ। যাঁর বইয়ের অভিনয় হচ্ছিল তিনিও অভিনয়ে নেমেছিলেন, তাঁর নাম Margaret Carter. অভিনেতা অভিনেত্রীদের বয়স বেশী নয়, সংখ্যাও অল্প। সব সুদ্ধ নয় জন অভিনয় করেছিলেন।

এই থিয়েটারটি যাঁরা চালান তাঁরা ঠিক শখের খাতিরে চালান না, ঠিক্ লাভের খাতিরেও না। তাঁরা একটি বন্ধু মণ্ডলী—তাঁরা একটি সুন্দর আইডিয়া নিয়ে কাজে নেমেছেন, ছোটদের একটা বড় অভাব দূর করেছেন, একটি স্থায়ী থিয়েটারের অভাব। প্রত্যেক ইস্কুলে মাঝে মাঝে যে রকম থিয়েটার হয় তাতে ভালো অভিনয় সব সময় দেখা যায় না, তাতে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁদের অন্য কাজ আছে, তাঁরা অভিনয় কার্যে সমস্ত প্রাণ মন ঢেলে দিতে পারেন না। কিন্তু এই থিয়েটারটিতে যাঁরা আছেন তাঁরা সব কাজ ছেড়ে এই কাজে নিপুণ হচ্ছেন, তাঁদের কেউ বা বই লেখেন, কেউ বা প্রোডিউস্ করেন, কেউ সীন্ আঁকেন, কেউ আস্‌বাব

তৈরী করেন, কেউ পোশাক তৈরী করে দেন। অনুষ্ঠানটির সেক্রেটারী হচ্ছেন Magaret Carter. তিনি লেখেনও ভালো। স্কুলগুলির সঙ্গে এঁদের বন্দোবস্ত আছে, এঁরা স্কুলের ছেলেমেয়েদের দলবলকে সস্তায় থিয়েটার দেখান।

কাল কী কী অভিনয় হলো বলি এবার। প্রথমে "আল্‌ফ্রেড ও পোড়া পিঠে" নামক সেই ইতিহাসের গল্পটা। অনেক শত বছর আগে রাজা আল্‌ফ্রেড তাঁর প্রজাদের সুখ দুঃখ চোখে দেখবার জন্যে ছদ্মবেশে বেড়াতে বেড়াতে এক পল্লী গৃহিণীর গৃহে বিশ্রাম করেন। সেই গৃহের উনুনের ধারে কয়েকটি পিঠে রেখে গৃহিণীর অল্পবয়সী দাসীটি খেলা করতে বেরিয়ে যায়। অতিথির অমনোযোগ বশত পিঠেগুলি পুড়ে যায়, গন্ধ পেয়ে গৃহিণী ছুটে এসে দেখেন দাসী নেই, পিঠেগুলি পুড়ছে। অতিথিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি মেয়েটির দোষ নিজের ওপরে টেনে নিয়ে বলেন, "একটা বিশেষ কাজে আমিই মেয়েটিকে বাইরে পাঠিয়েছি। আমারি দোষ।" তখন গৃহিণী ভীষণ চটে বললেন, "তবে তার বদলে তুমিই বেত খাও।" এই বলে যেই তাঁকে মারা অমনি রাজার অনুচর এসে পড়ে বললে, "করছ কী? ইনি যে রাজা!" তারপর গৃহিণী জানু পেতে মাপ চাইলেন, রাজা হেসে ক্ষমা করলেন এই শর্তে যে দাসীটিকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন, তাঁর একজন সভাসদের সঙ্গে তার ভালোবাসা আছে তিনি জেনেছেন, তার সঙ্গে বিয়ে দেবেন। দাসীটি উচ্চ বংশের মেয়ে, ভাগ্যদোষে দাসী হয়েছিল।

যে মেয়েটি বালিকা দাসী সেজেছিল তার বয়স বেশী নয়, চমৎকার অভিনয় করলে। রাজা আলফ্রেডের পোশাক সেকালের মতো গাম্ভীর্যময় হয়েছিল। সবচেয়ে ভালো হয়েছিল পল্লী-গৃহিণীর গৃহিণীপনা, যেমন তাঁর গলার জোর তেমনি তাঁর গায়ের জোর, যেমনি তিনি কড়া তেমনি তিনি ব্যস্ত। অন্য সকলে অভিনয়ই করছিল, তিনি সত্যি সত্যি রায়বাঘিনীগিরি করছিলেন। একেই বলে সেরা অভিনয়।

এর পরে একটি গীতাভিনয়। ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার বেকার হয়ে ঘরে বসে আছে। একটি সুন্দরী মেয়ে নাচতে নাচতে এসে বললে, "Soldier, Soldier, won't you marry me ?" সৈনিক উত্তর দিলে, "তোমার মতো সুন্দরীকে বিয়ে করব, আমার জুতো নেই যে!" মেয়েটি নাচতে নাচতে জুতো কিনতে গেল। আরেকটি সুন্দরী মেয়ে নাচতে নাচতে এসে বললে, "Solider, solider, won't you marry me ?" সৈনিক উত্তর দিলে, "তোমার মতো মেয়েকে বিয়ে করব, আমার কোট নেই যে!" সে মেয়েটিও নাচতে নাচতে কোট কিনতে বেরিয়ে গেল। প্রথম মেয়েটি জুতো এনে দিয়ে বললে, "Soldier, soldier. won't you marry me ?" সৈনিক উত্তর দিলে, "আমার টুপী নেই যে!" মেয়েটি টুপী আনতে গেল। দ্বিতীয় মেয়েটি কোট এনে দিয়ে বললে, "Soldier, soldier, won't you marry me ?" সৈনিক বললে, "আমার দস্তানা নেই যে!" সে মেয়েটি দস্তানা আনতে গেল। প্রথম মেয়েটি টুপী এনে পরিয়ে দিলে।

দ্বিতীয় মেয়েটি দস্তানা এনে পরিয়ে দিলে। দু'জনেই বললে, "Soldier, soldier, won't you marry me ?" সৈনিকের এবার চেহারা ফিরে গেছে। সে লাফ দিয়ে উঠে বললে, "তোমাদের এখন কেমন করে আমি বিয়ে করি? আমার যে বৌ আছে, ছেলে আছে!" তখন একধার থেকে টুপীর পরে টান, আরেক ধার থেকে দস্তানার পরে টান, এক ধার থেকে জুতোর পরে, আরেক ধার থেকে কোটের পরে। নিধিরাম হাঁ করে চেয়ে রইল, তারপর গিয়ে নিজের আসনটিতে বসে পড়ল, মেয়ে দুটি চলে গেল জুতো টুপী কোট দস্তানা নিয়ে নাচতে নাচতে।

এর পরে আরেকটি গীতাভিনয়—একটি প্রাচীন ছড়াকে দৃশ্যে পরিণত করা হয়েছে। একজন সেজেছিল জ্যাকেট, আরেকজন পেটিকোট। তাদের দড়ি দিয়ে রোদে ঝুলিয়ে দেওয়া হোল, কুয়োয় ফেলে দিলে, উদ্ধার করে আবার ঝুলিয়ে রাখলে। তারপরে A. A. Milneএর লেখা একটি কবিতার মূকাভিনয়—"The knight whose armour didn't squeak." দুই নাইটের জন্যে দুটি কাঠের ঘোড়া দেখা গিয়েছিল স্টেজে। একটি দম দেওয়া কলের ঘোড়া ও ঘোড়-সওয়ার স্টেজের এপাশ থেকে ওপাশ দৌড় দিয়েছিল। তারপরে দু'টি Sea Chantey অর্থাৎ জাহাজের নাবিকের গান গাওয়া হোল। বলতে ভুলে গেছি, স্টেজে যখন গীতাভিনয় বা গান ইত্যাদি হতে থাকে তখন স্টেজের নীচে পিয়ানো বাজান হচ্ছিল।

এর পরে একটা খুব চমৎকার গীতাভিনয় হলো। বার্বারী উপকূলের জলদস্যুদের জাহাজের সঙ্গে ইংরেজদের জাহাজের লড়াই। বার্বারীদের জাহাজটা গোলা খেয়ে ডুবল ও জলদস্যুরা ডুবে মরবার সময় খুব অঙ্গভঙ্গী সহকারে ঘটা করে মরল। দর্শকরা তো প্রত্যেক অভিনয়ের শেষে ঘন ঘন করতালি দিচ্ছিলই, এই অভিনয়টার শেষে অনেকক্ষণ ধরে করতালি দিয়ে শেষাংশটুকু আরেক বার অভিনয় করিয়ে তবে ছাড়লে। বার্বারী জলদস্যুরা উত্তর আফ্রিকার মুর, তাদের কানে বড় বড় ring, তাদের গায়ের রঙ কালো।

এর পরে একটা "Mime play" অর্থাৎ মূকাভিনয়। তিন বোনের এক খুড়ী তাদের পড়াতে এলেন, পড়াতে পড়াতে ঢুলতে লাগলেন, এই অবসরে তাদের বাড়ীর ছোকরা সহিসের (Stable boy) সঙ্গে তারা নাচতে শুরু করে দিলে। বাগানের যেখানটায় তারা নাচছিল সেখানে একটা মূর্তি ছিল, সেই মূর্তির নাম অনুসারে নাটকটার নাম হয়েছে "The Statue." ঘা লেগে statueটার একাংশ ভেঙে যায়, তা দেখে নাচ তো গেল থেমে, ভয়ে সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। খুড়ীর যখন ঘুম ভাঙল তখন তিনি দেখেন তিন ভাইঝি কাকে যেন আড়াল করছে, তিনি উঠে গিয়ে যার কাছে দাঁড়ান তারি পিছনে কে একজন লুকোয়, কিছুতেই ধরতে না পেরে তিনি আবার এসে একটু ঝিমুলেন। এই অবসরে মেয়ে তিনটি সেই ছেলেটাকে নিয়ে মূর্তির জায়গায় মূর্তির মতো ত্রিভঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে দিলে, খুড়ী

চোখ চেয়ে যেই তার কাছে যান অমনি সে বাঁকা হয়ে দাঁড়ায়, যেই ফিরে আসেন অমনি সোজা হয়ে দাঁড়ায়, অবশেষে খুড়ীর কেমন যেন সন্দেহ হলো মূর্তিটা কি জ্যান্ত? সাহস করে তিনি যেই তার গায়ে হাত ছুঁইয়েছেন, অমনি সে শিউরে উঠে বললে "হুঁ!" তখন ভূতের ভয়ে খুড়ীর মূর্চ্ছা হয় আর কি!

এদের সকলেরই অভিনয় এমন হয়েছিল যে কথা না বলেও এঁরা অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যের দ্বারা গল্পটির কিছুই বোঝাতে বাকী রাখেননি। এঁদের পোশাক গত শতাব্দীর ধরণের— বেশ ঢিলেঢালা। নাচটাও হয়েছিল সেকালের মতো আয়েসপূর্ণ, একালের মতো তাড়াহুড়াময় নয়। নাচের বাজনা (পিয়ানো) নামজাদা সঙ্গীতকারদের সুরে বাজছিল— Brahms, Debussy, Chopin, Tschaikowsky. আজকালকার jazz bandএর মতো নয়। ছোটবেলা থেকে উঁচুদরের সঙ্গীতের সঙ্গে ও নাচের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে এঁরা শিশুদের রুচিকে ভালো দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন।

সবশেষে সবচেয়ে সফল অভিনয় Margaret Carterএর নাটিকা "The Dutch Doll" অর্থাৎ "হল্যাণ্ড দেশের পুতুল।" সীন্ উঠতেই দেখা গেল একটা বুড়ে হ্যা—চ্—চো করে হাঁচ্‌ল। তার বুড়ী এসে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, "এখন থেকে তিন বেলা খেতে দিতে পার্‌ব না, দু বেলা খেতে হবে, আমরা বড় গরীব হয়ে পড়েছি।" তাদের মেয়ে তাদের কাছে বিদায় নিতে এল, সে এক অভিনেত্রীর কাছে চাক্‌রি

পেয়েছে, তার আশা সেও একদিন অভিনেত্রী হয়ে উঠবে। তাকে বিদায় দেবার সময় বুড়োবুড়ী কেঁদে ফেললে, সে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে খুশি মনে বিদায় হলো। একটু পরে একখানা চিঠি এল, বুড়োর আত্মীয় লিখেছে, "আমি তোমার মেয়েটিকে দেখতে যাচ্ছি, যে কোনো মুহূর্তে পৌছতে পারি, দেখব মেয়েটি লক্ষ্মী কি না, রাঁধতে বাড়তে জানে কি না, আমার ছেলের উপযুক্ত কি না।" বুড়ো বললে, "সর্ব্বনাশ, মেয়ে তো চলে গেল, আর মেয়ে তো রাঁধা বাড়ার ক—খ—গ জানে না, তার মন কেবল নাচ গানে।" বুড়ী বললে, "একটা বুদ্ধি এঁটেছি। যাও, ঐ ঘর থেকে ঐ পুতুলটাকে নিয়ে এসো, ওটাকেই মেয়ে বলে চালাতে হবে। তোমার আত্মীয় তো তোমার চেয়েও বুড়ো, চোখে দেখতে পায় না ভালো, কানে শুনতে পায় না ভালো, আজকের মতো ওকে রাতের আবছায়াতে ভোলাতে পারা যাবে।"

একথা বলতে বলতে দরজায় ঘা পড়ল। কে এল? এল —আত্মীয় নয়, তার ছেলে! বুড়ো তো তাকে বসিয়ে খাতির করছে, বুড়ী লেগে গেছে পুতুলটাকে নাইয়ে ধুইয়ে কাপড় পরাতে। শেষে পুতুলটাকে এনে এক কোণে দাঁড় করানো হোলো, পুতুলটা কলের পুতুল, তার পিছনে দাঁড়িয়ে দড়ি টানলে সে হাত পা নাড়ে, "হাঁ" "না" বলে ও নাচে। ছেলে যেই তার সঙ্গে করমর্দন করতে গেছে তার হাত ধরেছে জাপটে। যেই জিজ্ঞাসা করেছে, "কেমন আছেন?" উত্তর দিয়েছে "না।" টেবিলে খেতে বসে পুতুলটা কেবলি দুই

হাত মুখে তুলছে ও নামাচ্ছে দেখে বুড়ো যেই দড়িটাকে আরেক রকম করে টেনেছে অমনি সে দুই হাত ঘুরিয়ে লাগিয়েছে পাশের লোককে দুই চড়। চড় খেয়ে ছেলেটা গেল ক্ষেপে। বুড়ো দেখলে ব্যাপার ভালো নয়, দড়িতে টান দিতেই পুতুল লাগল নাচতে, ছেলেটা দেখে এত খুশি হলো যে তখুনি বলে ফেললে, "আমি একে বিয়ে করবই।" বুড়ী পুতুলটাকে ঘুম পাড়াতে নিয়ে যাবার সময় ছেলেটা বিয়ে পাগলার মতো ছুটতে চায় তার সঙ্গে, বুড়ো তাকে অনেক কষ্টে সে রাত্রের মতো বিদায় করে পর দিন আসতে বললে। কিন্তু রাত না পোহাতেই সে এসে দ্বারে দিয়েছে ধাক্কা। ইত্যবসরে বুড়োর মেয়ে ফিরে এসেছে নিরাশ হয়ে, অভিনেত্রী তাকে বলেছে, "অভিনয় শিখতে চাও তো আগে রান্না করা বাসনমাজা প্র্যাক্‌টিস্‌ করো, তারপর স্টেজে নামবে।" বেচারী ওবিদ্যা জানে না, নাচগানের দিকে তার ঝোঁক, তাই সে রাগ করে ফিরে এল। তারপর সেই ছেলের সঙ্গে সকালবেলা তার দেখা। ছেলে বললে, "কাল তুমি কী সুন্দর নাচলে। তুমি আমার বৌ হলে তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না।" মেয়েটি তো ভারি খুশি হয়ে বিয়ে করতে রাজি হোলো। বুড়োবুড়ীর ভারি আনন্দ। চার জনে মিলে খুব এক চোট নেচে নিলে। ছেলেটি বললে, "দেখ, কাল আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল তুমি মানুষ নয়, পুতুল।" মেয়েটি বললে, "এতে আর সন্দেহ কী? মেয়েমানুষ মাত্রেই পুতুল থাকে, যতদিন না তাকে কেউ বিয়ে করে মানুষ করে দেয়।"—

খুব সুন্দর গল্প, খুব সুন্দর অভিনয়। গৃহসজ্জা বড় খাসা হয়েছিল, ঠিক একটি গরীবের কুঁড়ের মতো, দরজা জানালা সত্যিকারের। এদিক থেকে ইউরোপের থিয়েটারগুলি আমাদের তুলনায় অশেষ উন্নতি করেছে, স্টেজের ওপরে সব রকম দৃশ্য দেখানো হয়ে থাকে। পারীতে (Paris) আমি সমুদ্র সাঁতার, জাহাজে ডুবি, কামানের গোলার আগুন ইত্যাদি সত্যিকারের মতো দেখেছিলুম একবার। "Children's Theatre"এ অবশ্য অত আয়োজন সম্ভব নয়, ওসবের খরচ উঠবে না। তা ছাড়া ছোটদের কল্পনাশক্তি বড়দের চেয়ে ঢের প্রখর, তারা স্টেজের ওপরে অত কিছু না দেখলেও কল্পনায় দেখতে পারে; তাদের কল্পনাশক্তিকে সজাগ রাখতে হলে যত কম আয়োজন করা যায় তত ভালো।

যাঁরা কাল অভিনয় করেছিলেন, তাঁরা শুধু অভিনেতা অভিনেত্রী নন, ম্যানেজার ও প্রোডিউসার। সুতরাং এঁদের কত খাটতে হয় আন্দাজ করতে পারো। সকলেরই অতিরিক্ত খাটুনি আছে। তাছাড়া সকলেরই ঘর সংসারের দায়িত্ব আছে। অল্পবয়সের মেয়ে এখন থেকেই অভিনয়ে দক্ষ হচ্ছে ও নিজের জীবিকা অর্জন করছে, এমনটি আমাদের দেশে হবার জো নেই। কাল যেসব খোকা-খুকীরা অভিনয় দেখে ফিরল তাদের কেউ কেউ একটু বড় হয়ে অভিনেতা অভিনেত্রী হয়ে উঠবে, Ellen Terry যেমন আট বছর বয়স থেকে অভিনেত্রী হয়েছিলেন। এদেশে বাপ-মা-ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকেই এক একজন অভিনেতা-

অভিনেত্রী, এমনও দেখা যায়; যেমন Forbes-Robertson পরিবার। নাচ করা, অভিনয় করা, গান করা, বাজনা বাজানো, এদেশে খুব প্রশংসার কাজ এবং তাই অনেকের জীবিকা। আমাদের দেশে একটি ভদ্রঘরের মেয়ে কেবল বেহালা বাজিয়ে টাকা রোজগার করছে এমনটি দেখা যায় কি? এখানে তেমন মেয়ে অনেক। অনেক মেয়ে বায়োস্কোপের অভিনেত্রী হতে ছেলেবেলা থেকে শিক্ষা পায়, অনেক মেয়ে থিয়েটারে ঢোকে। তাদের কত সম্মান!

লণ্ডন, ১৩৩৫

জার্মেনী—সারল্যাণ্ড

বুস্ (Bous) বলে জার্মেনীর একটি গ্রাম, হাজার পাঁচেক লোকের বাসস্থান। কাছেই সার নদী। নামে নদী বটে, আসলে খাল। তবু এতে ছোট ছোট জাহাজ যাওয়া আসা করে। নদীর ধারে মাঝারি গোছের নানা রকম ফ্যাক্টরী, অধিকাংশই লোহার। লোহা একটু দূর থেকে—আলসাস্ লোরেন্ থেকে আসে। কয়লা এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়। কারখানাগুলো আপাতত কিছুকাল ফরাসীদের দখলে। যুদ্ধের পরে এই অঞ্চলটা ফরাসীরা কিছুকালের জন্যে ভোগ করছে।

তা জার্মানরা যে মুখ শুকিয়ে মরে রয়েছে এমন নয়। তারা ভীমের মতো খাটছে এবং খাটুনির ফাঁকে গান বাজনায় মশগুল হচ্ছে। এই ছোট গ্রামটিতে যেসব লোক থাকে তারা অধিকাংশই মজুর। তারা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতি দল ৮ ঘণ্টা করে কারখানার কাজ করে। রাত দিন ২৪ ঘণ্টা কারখানার কাজ চলেছে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দলের দ্বারা। সকাল ছ'টায় যারা কাজ করতে যায় তারা বেলা দুটোয় ফেরে। তার পরে অন্য একটা দল কাজে যায়। রাত দশটার সময় আবার দল বদল হয়। কারখানা থেকে ফিরে এরা কী করে বল্‌তে পারো? এরা বাড়ীর কাজে লেগে যায়। নিজের নিজের বাড়ী এরা নিজেরাই তৈরি

করেছে। সে সব বাড়ী তৈরি করবার সময় অবশ্য মুানিসি-
পালিটীর সাহায্য পায়।

বাড়ীগুলি কত সুন্দর, কত বড় ও কত সাজানো গোছানো তা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না, আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিনে। ইংলণ্ডের মজুরদেরও এমন বাড়ী নেই। আমি এই গ্রামে ডাক্তারের বাড়ীতে আছি। ডাক্তারের আয় মজুরদের চেয়ে অল্পই বেশী। তবু আমাদের দেশের গ্রাম্য ডাক্তারের সঙ্গে তুলনা না করে গ্রাম্য জমিদারের সঙ্গে তুলনা করলেও লজ্জিত হতে হয়।

সুন্দর একটি বাড়ী, তার সঙ্গে একটি বাগান। বাগানে বাড়ীর মালিক সারাক্ষণ কাজ করেন। সত্তর বছর বয়সের বুড়ো, এখন তাঁর প্র্যাকটিস্ তাঁর জামাইকে দিয়েছেন, জামাইও ডাক্তার। বুড়োর বড় ছেলে কাছের গ্রামের এক ফ্যাক্টরীর কর্তা, বয়স বেশী নয়, যোগ্যতার জোরে পদোন্নতি করেছেন। ছোট ছেলের বয়স বারো চোদ্দ, কাছের গ্রামের এক Gymnasiumএ পড়ছে, লেখাপড়ায় ভালো নয় বলে বুড়ো নিজেই তাকে সাহায্য করেন। কিন্তু চালাক ছেলে, মজবুৎ গড়ন, নানা বিষয়ে চোখ কান খোলা রেখেছে, বড় হলে কোনো একটা বিষয়ে বিচক্ষণ হবেই। হবার উপায়ও আছে। কেননা আমাদের মতো এদের পরিবার বৃহৎ নয়, এবং পরিবারের ভার এদের বইতে হয় না। Ernst যা ইচ্ছা তাই পড়তে পারে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারে এবং যত দেরিতে ইচ্ছা তত দেরিতে বিয়ে করতে পারে। বিয়ে

করলেও ভয় নেই, কেননা এদেশের বৌদের পিতৃদত্ত সম্পত্তি যদি না থাকে তো নিজের হাত-পা থাকে ; তারা সংসারের আয় বাড়াবার হাজারো সুযোগ পায়।

এদের বাড়ীর আগাগোড়া আর্টিস্টিক। জানালা দরজা দেয়াল আস্‌বাব বিছানা আলো যেদিকে চোখ পড়ে সেদিকে দেখি রঙের বৈচিত্র্য, গড়নের কারুকার্য, সূচীশিল্পের নিদর্শন। প্রত্যেকটি ঘরের দেয়াল ভিন্ন ভিন্ন রঙের। এটি লেখবার পড়বার ঘর। এটির দেয়ালের রঙ্‌ বাসি রক্তের মতো লাল। দরজার সাইজ অস্বাভাবিক বড়, গড়ন সাদাসিধে, রঙ্‌ সবুজ। দরজায় ঠেলা দিলে দেয়ালে ঢুকে যায় ; সীলিং শাদা। জানালা সবুজ। পর্দায় ছবি। দেয়ালে খান কয়েক পুরোনো ছবির প্রতিলিপি, খান কয়েক নতুন ছবি, এই বংশের এক তরুণ শিল্পীর আঁকা। একটি আলমারিতে কিছু জার্মান ও ফ্রেঞ্চ বই, নানা দেশের বইয়ের অনুবাদ। রবিবাবুর ফরাসী "ফাল্গুনী" ও জার্মান "ক্ষুধিত পাষাণ" আছে। উপরের ঘরে জার্মান "ভগবদ্‌গীতা" দেখেছিলুম। কৌচ এবং সোফাগুলির ছবি এদের নিজেদের ফরমায়েসে আঁকা, টেবিলক্লথ ও পর্দা এদের নিজেদেরই বোনা। "এদের" মানে Ernstএর মা'র ও দিদির।

একটা ঘরের মোটামুটি বর্ণনা দিলুম, অন্যান্য ঘরের প্রত্যেকেরই একটা বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেকেরই একটি প্রাণ আছে, প্রত্যেকেরই সাজসজ্জা ভিন্ন রকম। আসবাবপত্র প্রাচীন ও আধুনিক, ছবিগুলি বাছা বাছা, মেজে-দেয়াল-

সীলিং সর্বত্র বাড়ীর লোকের আর্টিস্টিক রুচি-রীতির ছাপ। দেয়ালে এই যে রঙ দেখছি এ রঙ ওয়াল-পেপারের নয়। ইংলণ্ডের বাড়ীগুলোতে ওয়াল-পেপারের ছড়াছড়ি, তাতে একই রকম ছাপানো design. এদের মেজেতে কার্পেট না দিয়ে এরা ভালোই করেছে। পালিশ করা কাঠের মেজে নিখুঁৎ ভাবে পরিচ্ছন্ন রাখা ঢের সহজ।

এরা অত্যন্ত সঙ্গীতভক্ত। পিয়ানো ছাড়া অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রও রাখে। প্রত্যেকেই গাইতে বাজাতে পারে। পরিবারের সকলেই এক সঙ্গে খায়, এক সঙ্গে গায়, এক সঙ্গে বাজায়, এক সঙ্গে খেলা করে। বয়স্ক ছেলের সঙ্গে বুড়ো বাপ-মার প্রাণখোলা হাসি ঠাট্টা আমাদের দেশে দেখতে পাইনে। আমাদের ঠাকুরদা ও নাতি যেমন প্রাণ খুলে মিশতে পারে এদের বাপ ছেলেও তেমনি।

জার্মান জাতটাই সঙ্গীতভক্ত। কারখানার মজুরদের বাড়ীতেও বাদ্যযন্ত্র আছে, তারা সময় পেলেই সঙ্গীত চর্চা করে। পরশু আমি গিয়েছিলুম এক দর্জীর বাড়ী। দর্জীর ছেলে বেহালা শোনালে। আর একটি মেয়ে দিলে একটি ফুলের তোড়া উপহার। এদের জাতীয় সমৃদ্ধি যুদ্ধের দ্বারা ধ্বংস হয়নি। কেননা, যুদ্ধের দ্বারা এদের কর্মঠ প্রকৃতি ধ্বংস হয়নি। যখন যাকে দেখি তখন সেই কিছু না কিছু কাজ করছে। রেলে বেড়াবার সময় মেয়েরা সেলাই করছে, কথা বলবার সময় বাড়ীর গিন্নী সেলাই করছেন, রান্না করবার সময় বাড়ীর ঝি খবরের কাগজ পড়ছে, কারখানার মজুরনী

টিফিনের ছুটিতে ষ্টোভে রান্না চড়িয়ে কঠিন বৈজ্ঞানিক বই পড়ছে। অথচ খেলাধুলারও কম্‌তি নেই, ছোটরা তো আমাদের দেশের মতো কত রকম খেলাধূলায় লেগে আছেই, বড়দের জন্যে টেনিস ফুটবল ইত্যাদি ছাড়া একটা প্রকাণ্ড সুইমিং বাথ আছে, ম্যুনিসিপালিটীর দ্বারা তৈরি। তাতে প্রতিদিন পালা করে মেয়েরা ও পুরুষেরা সাঁতার কাটে এবং তার একটা অংশ ছোটদের জন্যে অগভীর করে গড়া।

সেদিন সেই দর্জীর ছেলেদের আসতে বলা হয়েছিল আমাদের এখানে। কাল সন্ধ্যার পরে তারা আমাদের surprise দেবার জন্যে কখন এক সময় এসে বাগানে বাজনা শুরু করে দিয়েছে—বেহালা আর Zither. শেষোক্ত যন্ত্রটাতে অনেকগুলো তার, দুই হাতের দশ আঙুলে বাজাতে হয়। অনেকক্ষণ বাজনা চলল, মাঝে মাঝে বাড়ীর লোকেরা গান ধরলেন তার সঙ্গে। বাড়ীর ঝিরাও এসে কর্তা গিন্নীর কাছে চেয়ার নিয়ে বসল এবং সকলের সঙ্গে গেলাস ছুঁইয়ে সরবৎ পান করলে। মদ না বলে সরবৎ বললুম এই জন্যে যে, তাতে alcohol ছিল না এবং তা বাড়ীতেই তৈরি। কাল রাত্রের গান বাজনার মজলিসে আমরা বয়সে ও পদমর্যাদায় ছোট বড় সবাই ছিলুম—Ernst চোদ্দ বছর বয়সের ছেলে; কেবল Hermann ঘুমিয়ে পড়েছিল, তার বয়স চার পাঁচ বছর, সে বুড়োর মেয়ের ছেলে।

পরিবারের সকলে মিলে যখন রাইনল্যাণ্ডের স্থানীয় সঙ্গীত গাইছিল তখন আমার বড় রোমান্টিক লাগছিল।

বাজনাও চলছিল তার সঙ্গে মোহ মিশিয়ে এবং সরবৎ খাওয়া চলছিল তার সঙ্গে ঘোর লাগিয়ে। বৃহৎ বাগানের বড় বড় গাছগুলোর উপরে তারা ভরা আকাশ ঝুঁকে পড়েছিল। কেবল দূর থেকে আসছিল ফ্যাক্টরীগুলোর আওয়াজ। গানবাজনার শেষের দিকে আমরা যখন শুতে গেলুম তখন অল্পবয়সী ঝিরা নিজেদের মধ্যে একটু নাচলে আর তাদের আত্মীয় সেই দর্জীর ছেলেরা নাচের বাজনা বাজালে। নাচের আনন্দ থেকে আমাদের দেশ বঞ্চিত। কিন্তু এরা ছেলে বুড়ো ছোটলোক বড়লোক সবাই নাচতে জানে, গাইতে জানে, বাজাতে জানে। রাত্রের খাওয়া শেষ হলে একটা-কিছু আমোদ করা এসব দেশের পারিবারিক কর্তব্য। গান এদের পক্ষে তেমনি সহজ পাখীর পক্ষে যেমন। রেলে চড়ে ভিন্ গাঁয়ের মজুরেরা ফিরছে, তাদের সেই 4th classএর কামরা থেকে গানবাজনার ধ্বনি আসছে। Ernst আর তার মা বাড়ী ফিরছেন, ছ'জনে মিলে হাল্কা সুরের গান ধরেছেন। মা'র বয়স ষাট, কিন্তু দিব্যি জোয়ান আছেন দেহে মনে।

আমার ধারণা ছিল জার্মানরা বড় গুরু-গম্ভীর জাত। কিন্তু দেখছি যুদ্ধে হেরে তাদের ফূর্তি বেড়ে গেছে। তাদের দেখে কে বলবে এরা ধনে-প্রাণে অনেক লোকসান দিয়েছে, এখনো এদের ভয়ানক দেনা, এখনো এই সার অঞ্চলটা পরাধীন ও এর কারখানাগুলো ফরাসীরা দখল করে বসেছে? হাসি সকলের মুখে লেগেই আছে, বিশেষ করে যে সব

বুড়োবুড়ীর ছেলে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে ও টাকা যুদ্ধে উড়ে গেছে সেই সব বুড়োবুড়ীর হাসি দেখে অবাক হতে হয়! এই বাড়ীতে ফরাসীরা আড্ডা গেড়েছিল। এই বুড়োর অনেক টাকা যুদ্ধে লোকসান গেছে।

আজ এক ছাপাখানায় গিয়েছিলুম। বিরাট ছাপাখানা। রঙীন বিজ্ঞাপন ও সিগারেটের বাক্স ইত্যাদি সব দেশের জন্যে তারা ছেপে দেয়। ছাপাখানার যারা মালিক তারা হাইস্কুলেও পড়েছে, অথচ তাদের অধীনে শ'দুয়েক মেয়ে খাটছে। পুরুষ সে কারখানায় অল্পই দেখলুম। বড় বড় কলগুলো অল্পবয়সী মেয়েরাই চালাচ্ছে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। জার্মান মেয়েদের ও পুরুষদের মুখ গোল ও নিটোল। মেয়েদের অনেকের কবরী আছে, অনেকের চুল ছোট করে কাটা। আর পুরুষদের অধিকাংশেরই মাথা মুড়ানো, কেবল কপালের উপরে দু'এক ইঞ্চি জায়গা চুলের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—সেই এক গোছা চুলে অতি অপরূপ টেড়ী। দেখলে মনে হয় লেস-বাঁধা ফুট বল! কিংবা কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি!

এখানে মোটরগাড়ী সংখ্যাতীত। তবু গোরুর গাড়ীও দেখছি। সেসব গাড়ীর কোনো কোনোটার গাড়োয়ান মেয়েমানুষ। ক্ষেতের কাজও মেয়েমানুষে করে। তা বলে তাদের ঘরকন্নার কাজ আকাশের পরীরা করে দিয়ে যায় না, কিংবা পুরুষ মানুষে করে না, তারা নিজেরাই করে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে রান্না হয়, তাই বেশী সময় লাগে না।

ফ্যাক্টরী ঝাঁট দিয়ে যে সব আবর্জনা জড় করা হয়

সেগুলো দিয়ে গোটা কয়েক কৃত্রিম পাহাড় তৈরি হচ্ছে, তার উপরে চারা গাছ পুঁতে জঙ্গল তৈরি হচ্ছে। এক আশ্চর্য দৃশ্য! আবর্জনাপূর্ণ গাড়ী চলেছে পাহাড়ের উপরে লটকানো তার বেয়ে, বিদ্যুতের সাহায্যে। আবর্জনা উজাড় করে তার বেয়ে আপনিই নেমে আসছে। এই নকল পাহাড় জঙ্গলগুলো দেখলে সত্যিকারের মনে হবে আর বছর কয়েক পরে।

মিউনিসিপালিটী থেকে যে স্কুল করা হয়েছে তাতে অন্তত তিনটি বছর প্রত্যেক ছেলেকেই পড়তে হয়, হোক্ না কেন সে রাজার ছেলে। তেরো চোদ্দ বছর বয়স অবধি এই স্কুলে বিনা পয়সায় পড়তে পারা যায়। Gymnasiumএ পড়তে পয়সা লাগে। সেটা একটু উঁচুদের স্কুল। স্কুলের বাড়ী বড়, সাজ সরঞ্জাম অশেষ রকম।

মিউনিসিপালিটী থেকে একটা বাড়ী বানিয়ে দিয়েছে, তাতে Nunরা থাকে। আর থাকে সেই সব বুড়োবুড়ীরা যাদের আশ্রয় নেই। এই সব Nunরা পরের ছেলে আগলায়, পরের বাড়ী গিয়ে শুশ্রূষা করে আসে, এবং গ্রামের মেয়েদের রান্না সেলাই ও লেখা পড়া শেখায়। আর যেসব বুড়োবুড়ীরা তাদের আশ্রয়ে থাকে তাদের সেবা করে। এসব দেশে পিতামাতাকে পালন করা সন্তানের কর্তব্য নয়। পিতামাতার যদি সঞ্চয় না থাকে বা pension কম হয় তো তাদের দুর্দশা মোচন করে সমাজ। আমাদের দেশে এমনি সব আশ্রম হওয়া উচিত, সেখানে বিধবারা ভার নেবেন অনাথ শিশু ও নিরাশ্রয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধার।

একটি মজুর পরিবারে গিয়েছিলুম। অল্প কয়েকটি নিখুঁৎ ভাবে পরিচ্ছন্ন ঘর, তাতে অল্প কয়েকটি নিখুঁৎ ভাবে সাজানো আসবাব, সমস্তই বাড়ীর গিন্নীর কীর্তি। একটি রান্নাঘর—খাবার ঘর—ভাঁড়ার ঘর। একটি মা-বাবার ঘর। একটি খোকা খুকির ঘর। রান্না—খাবার—ভাঁড়ার ঘরে একটি কাবার্ডে আলাদা আলাদা এক সাইজের চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে পাত্রে চিনি, চা, মাখন ইত্যাদির নাম লেখা। অন্যান্য জিনিস সম্বন্ধে তেমনি সুব্যবস্থা; দরকারের সময় কোনো জিনিস খুঁজে নিতে এক সেকেণ্ডও লাগে না। শোবার ঘরের বিছানা ধবধবে, পুরু, রাজভোগ্য। ছেলেদের ঘরে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বিছানা—তেমনি আরামের। আমি যখন গিয়েছিলুম তখন মজুর কারখানা থেকে ফিরে বাগানের মাটি কোপাচ্ছিল, শাকসবজীর জন্যে তাকে বাজারে যেতে হয় না। মজুরনী বাড়ীর কাজ করছিল। তারা বাড়ীর কাজ করে ফুরসৎ পেলে সেলাই করে। ইংলণ্ডের চেয়ে জার্মানীর মজুরদের অবস্থা ভালো। যাদের বাড়ী গিয়েছিলুম তারা গরীব মজুর। অন্যান্য মজুরদের বাড়ী আরো বড়, বাইরে থেকে দেখতে আরো সুন্দর!

এবার আমাদের এই বাড়ীর কথা বলে শেষ করি। এদের সঙ্গে আমার এমন আত্মীয়তা হয়ে গেছে যে ঠিক্ বাড়ীর মতো লাগছে। সকলেই যেন 'আপনার লোক—কর্তা, গিন্নীর, তাঁদের মেয়ে, তাঁদের জামাই, তাঁদের ছেলে, তাঁদের নাতি, তাঁদের কুকুর। প্রথম প্রথম কুকুরটা আমার কাছে ছাড়া আর কোথাও যেতে না, তার তাতে একটা স্বার্থও

ছিল, কেননা আমার পকেট তখন বিস্কুটে ভরা ছিল। এখন কুকুর মশাইয়ের টিকিটিও দেখিনে, কিন্তু কুকুরের মালিক শ্রীমান্ এয়ার্ন্‌স্ট্ (Ernst) কুকুরের স্থান গ্রহণ করেছেন। দু'জনে মিলে দুষ্টুমি করে বেড়াচ্ছি। সে জানে দু'একটা ইংরেজী শব্দ, আমি জানি দু'একটা জার্মান শব্দ, আর দু'জনে জানি অল্প সল্প ফরাসী। তার দিদি খাসা ইংরেজী ও ফরাসী জানেন, সাহিত্য চিত্রকলা ও সঙ্গীতের সমঝদার। বাপের বাড়ীর পাশাপাশি তাঁর বাড়ী। যুদ্ধের সময় এঁরা সকলেই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। কেউ যোদ্ধারূপে, কেউ যুদ্ধ-ডাক্তাররূপে, কেউ যুদ্ধ-নার্সরূপে। কাছেই যুদ্ধ হচ্ছিল, অনবরত গোলা পড়ছিল, অনেক বাড়ী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, আবার নতুন করে তৈরি হয়েছে।

Ernstএর দু'খানা ঘর, বেশ বড় বড়। একটাতে সে শোয়, আর একটাতে পড়ে। পড়বার ঘরে তার গ্লোব, গ্রামোফোন, এয়ার গান্, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ক্লক্‌ঘড়ি, ক্যামেরা, ডাক টিকিট সংগ্রহের খাতা ইত্যাদি অনেক জিনিস থাকে। শোবার ঘরে তার আলনা দেরাজ মুখ ধোবার বাসন ইত্যাদি। কুকুটারটাও তার ঘরেই শোয়।

বুড়োবুড়ীর বসবার ঘরে একটা প্রাচীন কাঠের ক্লক্ ঘড়ি আছে, সেটাতে যখন একটা বাজে তখন একবার ও যখন বারোটা বাজে তখন বারো বার একটা কাঠের কুকু দরজা খুলে কুক্-উ করে ডাকে, ডাকা শেষ হলে দরজা বন্ধ করে গা-ঢাকা দেয়।

আজ দুটো কারখানা দেখতে গিয়েছিলুম। লোহার কারখানাটায় হাজার তিনেক মজুর খাটে, নিরেট লোহাকে আগুনে গরম করে কলে পূরে ফাঁপা করে পিঁপে বানানো হয়, গোটা দশেক কলের ভিতর দিয়ে লোহাখানাকে ক্রমান্বয়ে চালায়। ভারি চমৎকার লাগছিল, যদিও পুড়ে মরবার ভয় ছিল পদে পদে। কাঁচের কারখানায় মজুর ও মজুরনী মিলিয়ে শ'তিনচার খাটে, কাঁচ গালিয়ে কারুকার্যময় মদের গেলাস, আতরের শিশি, আলোর ঝাড় ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। খুব অল্পবয়সী ছেলেরা কাজে লেগেছে, কারুর স্বাস্থ্য ভালো নয়, কিন্তু গরীবের ছেলে, রোজগার না করলে চলবে না। তা বলে ভেবো না তারা ছুটির সময় লেখাপড়া করে না কিংবা চিরকাল মূর্খ থেকে যায়। তাদের মাইনে মাসে পঞ্চাশ টাকা থেকে দেড়শো টাকা। তাদের উপরে অপরের ভার নেই, কেননা বাড়ীর সকলেই রোজগার করে,—বাবা ফ্যাক্টরীতে, মা ক্ষেতে, ভাইবোন ফ্যাক্টরীতে বা ক্ষেতে। এমন কি বুড়োবুড়ীরাও চুপ করে বসে মালা জপে না। আজ এক থুথ্‌ড়ে বুড়ী পায়ে হেঁটে রাস্তায় বেড়াবার সময় ছুঁচ সুতো দিয়ে জামা বুনতে বুনতে চলেছিল।

এয়ার্ন্‌স্ট আর আমি পাহাড়ে উঠেছিলুম—সত্যিকারের পাহাড়ে। পা পিছলে আলুর দম হবার ভয়ে বুট খুলতে হলো, খুব উঁচু না হলেও খুব খাড়া পাহাড়। একটা গুহা দেখলুম, ওখান থেকে ছেলেরা নিচের ছেলেদের উপরে নকল বোমা ফেলে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলত। যুদ্ধের সময় এই অঞ্চলে

এরোপ্লেন থেকে শত্রুরা বোমা ফেলে অনেক কিছু ধ্বংস করে দিয়েছিল। তখন মেয়েরা মাটির নিচে গুহা করে লুকোতো আর সুযোগ পেলেই উপরে উঠে যুদ্ধে-যাওয়া ছেলেদের জায়গায় ফ্যাক্টরী চালাতো।

এখানকার মজুরদের বাড়ীগুলোর প্রত্যেকটার স্বতন্ত্র ডিজাইন, দেখে আনন্দ হলো। ইংলণ্ডে এক একটা পাড়ার সব বাড়ী একই রকম দেখতে।

বুস, সারব্রুকেন (জার্মেনী) ১৩৩৫

জার্মেনী—রাইনল্যাণ্ড

আমি এখন রাইন নদীতে জাহাজে করে যাচ্ছি। রাইন নদী সুইটজারল্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে জার্মেনীর ভিতর দিয়ে হল্যাণ্ডে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। এই নদীটির জন্যে দেশে দেশে রেষারোষি খুনোখুনি বড় অল্প হয়নি। ফ্রান্স বলে, "আমি এই নদী নেবো," জার্মেনী বলে, "খবরদার।" রাইনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে আপন মনে আল্পস্ পর্বতের বার্তা নর্থ সী'র কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে অবিশ্রান্ত ছুটেছে। যে পথ দিয়ে সে ছুটেছে সে পথে ছোট বড় অনেকগুলি শহর দাঁড়িয়ে গেছে, তারা দু'ধারে দাঁড়িয়ে দেখছে তার চলা। সব চেয়ে বড় শহরটির নাম কোলোন। সেইখান থেকে আজ রেলে চড়ে Bonnএ এলুম, বন্ থেকে জাহাজ ধর্‌লুম। উজানে চলেছি, বন থেকে Bingenএ। জাহাজটা যাবে Mainz অবধি। এই সমস্ত অঞ্চলকে বলে রাইনল্যাণ্ড। এখনো রাইনল্যাণ্ডে ফরাসী ইংরেজ ও বেল্‌জিয়ান সৈন্য আছে, ট্রিয়ারের এক গির্জা দেখতে গিয়ে সেই গির্জার বুড়ীর কাছে শুন্‌লুম। ট্রিয়ার অতি প্রাচীন শহর, জার্মেনীর প্রাচীনতম। রোমানরা সেই শহরে দুর্গ প্রভৃতি তৈরি করেছিল, এখনো ভগ্নাবশেষ আছে। রোমানদের ভাঙা amphitheatre

দেখে তখনকার নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হয়। আমাদেরি মতো তারা খোলা জায়গায় "যাত্রা" অভিনয় করত, দর্শকরা বসত স্টেজকে ঘিরে বৃত্তাকারে।

এখানকার ট্রিয়ার শহরে মধ্যযুগের ক্যাথলিক গির্জাটি একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য। ক্যাথলিকরা ইউরোপের হিন্দু অর্থাৎ পৌত্তলিক। তাদের গির্জার সর্বত্র সাধু ও সাধ্বীদের সুনির্মিত মূর্তি ও সুচিত্রিত জীবন-কাহিনী। ঘণ্টা বাজছে, প্রদীপ মিটমিট করছে, ভক্তেরা জানুপাত-পূর্বক ইষ্টমূর্তির কাছে মনস্কামনা জানাচ্ছে। ধূপধূনার গন্ধও পাওয়া যায়। হিঁদুয়ানীর সমস্তই আছে, কেবল পাণ্ডা-পূজারীর হট্টগোলটুকু নেই। গির্জাগুলোর চূড়ো সংকীর্ণ হতে হতে আকাশে মিশে গেছে, কোনো কোনোটা দু'শো তিনশো বছর ধরে তৈরি, দেখলে শ্রদ্ধা হয়।

ট্রিয়ার শহর মোজেল্ নদীর কূলে। মোজেল্ নদী Koblenz শহরে রাইন নদীর সঙ্গে মিলেছে। Koblenzএর এক দিকে Bingen ও Mainz, অন্য দিকে Bonn ও Cologne. আমি ট্রিয়ার থেকে কোলোনে গিয়েছিলুম রেলে। রেল চলে নদীর ধারে ধারে, প্রথমে মোজেল নদীর ধারে, পরে রাইন নদীর ধারে। রেলের এক দিকে নদী, অন্য দিকে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে দ্রাক্ষার (vine) চাষ। তা থেকে মদ প্রস্তুত হয়। রাইন্ল্যাণ্ড মদের জন্যে বিখ্যাত। দু'রকম মদ এদেশের লোকে খায় —রাইন মদ ও মেজেল মদ। তা ছাড়া বিয়ার অবশ্য

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পানীয়। কোনো একটা রেস্তরাঁতে গিয়ে জল চাইলে মুশকিলে পড়তে হয়, কেননা জল কেউ খায় না বলে কেউ রাখে না। খাবারের সঙ্গে এরা হাল্কা মদ খায়—বিয়ার কিম্বা মোজেল্-মদ কিম্বা রাইন-মদ। জল চাইলে সোডা ওয়াটার এনে হাজির করে, lemon squash গোছের কিছু আন্‌তে বলতে হয়। যে রকম সরবৎ বুস্-গ্রামে খেয়েছিলুম সে রকম সরবৎ আপেল ফল থেকে ঘরে তৈরি করা। কাজেই হোটেলে সে জিনিস মেলে না।

কোলোনের গির্জা ইউরোপের একটি নামজাদা গির্জা। সেটি ছাড়া আরো অনেক পুরানো গির্জা কোলোনে আছে। ক্যাথলিকরা যে কেমন সৌন্দর্যপ্রিয় তাদের গির্জায় গেলে তার পরিচয় পাই। গির্জাকে আশ্রয় করে ইউরোপের সঙ্গীত ও চিত্রকলা অভিব্যক্ত হয়েছে। গির্জার সমবেত সঙ্গীত ও সমবেত উপাসনা খ্রীস্টানকে যেমন ঐক্য দিয়েছে, হিন্দু তেমন ঐক্য কোনো কালে পায়নি।

কোলোনেও রোমান যুগের ধ্বংসাবশেষ আছে। সেটিও একটি প্রাচীন শহর। কিন্তু প্রাচীন হয়েও সেটি চির-আধুনিক। প্রতিদিন তার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। এখন আন্তর্জাতিক প্রেস্ প্রদর্শনীর জন্যে একটি উপনগর তৈরি হয়েছে। সমগ্র উপনগরটি জুড়ে আন্তর্জাতিক প্রেস্ প্রদর্শনী বসে। তা দেখ্‌তে পৃথিবীর সব দেশের লোক আসে। প্রদর্শনীতে ভারতবর্ষের মাত্র দু'চারখানা সংবাদপত্র

দেখ্‌লুম। বড় দুঃখ হলো। চীনদেশ থেকে লোক এসেছে কাগজ তৈরি করে দেখাতে, আমেরিকার লোক এসেছে রঙিন ছবি ছেপে দেখাতে। জার্মেনীর লোক সংবাদপত্র মুদ্রণের আধুনিকতম কৌশল দেখায়। তিন চার মাইল জুড়ে বিরাট প্রদর্শনী—তার মধ্যে একটা ছোট রেল্ লাইন পর্যন্ত আছে, তাতে চড়ে এক পাশ থেকে আরেক পাশে যাওয়া যায়।

জার্মান ছেলেমেয়েরা পিঠে একটা Knapsack বেঁধে দল করে বেড়ায়। খুব ছোট ছেলেমেয়েদের দলে একজন বয়স্ক গাইড থাকেন। বেশী বয়সের যুবক যুবতীরাও খাকী পোশাক পরে ও পিঠে খাকী Knapsack বেঁধে বেড়ায়। পোশাকের বালাই জার্মেনীতে কম। এই চিঠি লিখছি আর নদীর এক ধারে এক দল ছেলেকে পোঁট্‌লা লাঠি ও পতাকা নিয়ে দল বেঁধে যেতে দেখ্‌ছি। জার্মেনীর পথে ঘাটে এই Wandervogel-এর দল। কোলোনে অতি ছোট বাচ্চাদের দল দেখেছি। অগাধ কৌতূহল নিয়ে তারা দেশ দেখে বেড়ায়। কোলোনের ইস্কুলে পড়্‌তে যে সব ছেলেমেয়ে যায় তারাও পিঠে একটা করে চামড়ার ব্যাগ বেঁধে যায়। জার্মেনীতে সকলেরই সাইকেল আছে, সাইকেলের ঝাঁক রাস্তা জুড়ে ওড়ে। অতি ক্ষুদ্র শিশু থেকে অতি বৃদ্ধ ঠাকুরদা পর্যন্ত সকলেই সাইকেল চালায়।

কোলোন থেকে বেরিয়ে বনে এলুম। বন্ ছোট শহর। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবী-বিখ্যাত। সেইখানে Beethoven-এর জন্ম। Beethoven-এর বাড়ী দেখ্‌লুম।

কোলোনের গির্জা
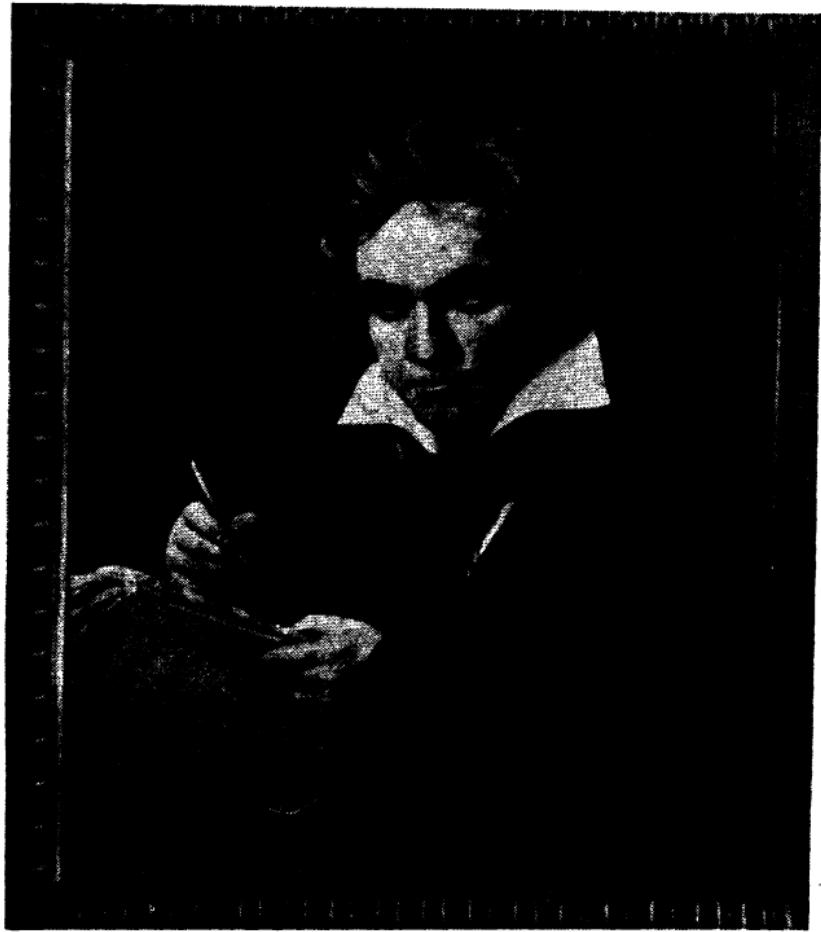
বেটোফেন (Beethoven)

সেখানে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন সংগৃহীত হয়েছে—তাঁর পিয়ানো, তাঁর কানে পর্‌বার যন্ত্র, তাঁর হাতের লেখা, তাঁর ছবি। তাঁর ছবির মধ্যে তাঁর ঝড়ঝঞ্ঝাময় জীবনের ইঙ্গিত আছে। দেখ্‌লেই তাঁর সমস্ত জীবন মনে পড়ে যায়। কী কঠোর সাধনা, কী কঠিন দুঃখ! জগৎকে যিনি অমৃতময় সঙ্গীত দিয়ে গেলেন নিজের সঙ্গীত তিনি নিজে শুনতে পেতেন না —তিনি হয়ে গিয়েছিলেন বধির। তাঁকে দেখ্‌বার সময় আমার মনে হলো—মহাপুরুষদের প্রতি আমাদের একটা ঋণ আছে, সে ঋণ শোধ করবার একমাত্র উপায় নিজে মহাপুরুষ হওয়া। হাত জোড় করে প্রণাম করা কাপুরুষতা, সম্মান দেখাতে যদি চাও তো সমকক্ষ হও।

বন্ থেকে জাহাজে চলেছি। নদীটি কিন্তু কলকাতার গঙ্গার চেয়ে চওড়া নয়। অথচ এই নদীকে নিয়ে কত গান, কত কাহিনী, কত যুদ্ধ। জাহাজ ও নৌকায় নদীটি সব সময় সেজে রয়েছে। ফরাসী জাহাজ স্ট্রাস্‌বুর্গ্ যাচ্ছে, ওলন্দাজ জাহাজ রটারডাম যাচ্ছে, জার্মান জাহাজ হামবুর্গ্ যাচ্ছে। কত রকম নৌকায় যুবক-যুবতী দাঁড় টেনে রোদ পোহাতে পোহাতে চলেছে, তাদের গা খোলা। সাঁতার দিচ্ছে ছেলেমেয়ে যুবক-যুবতী—একা কিম্বা দলে দলে। জার্মেনীতে আজকাল সাঁতারের ধূম, নৌ-চালনার ধূম। যার শরীর আছে সেই শরীর চর্চা করে। যুদ্ধে হেরে জার্মানরা ঠিক করেছে এমন একটা দুর্জয় জাতি সৃষ্টি কর্‌বে যে জাতির সঙ্গে কোনো বিষয়ে কোনো জাতি পেরে উঠবে না। সে

জাতি সৃষ্টি কর্‌তে হলে মেয়েদের সাহায্য চাই। তাই যেমন স্কুলে কলেজে তেমনি মাঠে নদীতে আকাশে সমুদ্রে মেয়েদের অবারিত দ্বার—অবাধ স্বাধীনতা। জার্মেনীর অন্যান্য অঞ্চলের কথা জানিনে, এই রাইনল্যাণ্ডের মেয়েদের স্বাস্থ্য ও শ্রী দেখে অবাক হতে হয়।

নদীর দু'ধারেই রেলপথ, পাহাড়, ক্ষেত। স্থানে স্থানে গ্রাম বা নগর। কোনো কোনো প্রাচীন ধরণের বাড়ী দেখ্‌তে ছবির মতো। ফ্যাক্টরীও স্থানে স্থানে আছে—কদাকার। কোথাও কেউ ছিপ ফেলে মাছ ধর্‌ছে। কোথাও কারা ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসেছে। আজ চমৎকার দিনটি। সূর্যের অসীম দয়া। আমাদের মতো অনেকেই জাহাজে করে বেরিয়েছিল, তারা ফির্‌ছে, তাদের জাহাজ থেকে তারা হাত নেড়ে আমাদের প্রীতি জানাচ্ছে। যারা সাঁতার কাট্‌ছে তারাও হাত তুলে প্রীতি জানাচ্ছে। একটা নৌকার উপরে একটা কুকুর দৌড়াদৌড়ি কর্‌তে কর্‌তে ঘেউ ঘেউ করে আমাদের কেমন প্রীতি জানাচ্ছিল তার মর্ম সেই বোঝে! নদীর ধারে পাহাড়ের তলে ট্রামও চলেছে। পাহাড় ঘেঁসে উঠেছে—প্রাচীন দুর্গ, Drachenfels। এর নামে কবি Byronএর এক কবিতা আছে; পাহাড়ের মাথায় সেই ভাঙা দুর্গ। সর্বত্রই দেখ্‌ছি হোটেল আর কাফে। আমেরিকানদের দৌলতে পৃথিবীর গরীব দেশগুলোর লোক হোটেল চালিয়ে বড় লোক হয়ে যাচ্ছে।

এখন আমাদের জাহাজ যেখান দিয়ে চলেছে সেখানটার

প্রায় চারিদিকেই পাহাড়। মনে হচ্ছে যেন একটা হ্রদের ভিতর দিয়ে চলেছি। পাহাড়ের পায়ের নিচেই নদী; নদীর পাড় ধরে ট্রেন চলেছে। পাহাড়ের উপর থেকে আমাদের প্রীতি জানাচ্ছে কত লোক, দূরস্থিত ঘরের জানালা থেকেও প্রীতি-সূচক হাত নাড়া পাচ্ছি আমরা। ট্রেন থেকে, মোটর থেকেও রুমাল নেড়ে লোকে প্রীতি জানাচ্ছে। Bingenএ জাহাজ থেকে নেমে Frankfortএর ট্রেন ধর্‌তে গিয়ে দেখি এক ঝাঁক Wandervogel (উড়ো পাখী)। তারাও ট্রেনে উঠ্‌তে ছুটলো। চতুর্থ শ্রেণীতে উঠলো—জার্মেনীর রেলে চতুর্থ শ্রেণী অবধি আছে। আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর মতো জার্মেনীর Third ও Fourth classএ কাষ্ঠাসন। এই Wandervogelএর ঝাঁকটির একজনের একটি পা নেই, সে কাঠের পায়া বেঁধে পরম উৎসাহে ছুট্‌ছিল। ওরা নেমেছে ও সমবেত গান ধরেছে। কী মধুর শোনাচ্ছে ওদের সমবেত গান! কোথায় আমাদের মতো চেঁচামেচি করে পাড়া মাথায় কর্‌বে, না, ওরা এমন মিষ্টি গান ধরেছে যে কী বল্‌বো!

*　　　　*　　　　*

Frankert-on-Main.

আজ সকালে রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমে যাদের দেখ্‌লুম তারা একদল wandervogel—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, কারুর কারুর পিঠে রান্নার ডেক্‌চী। আরেকটু পরে এক জন পথিককে দেখলুম, তার পিঠে পোঁট্‌লা, কম্বল ও লাঠি,

একত্র বাঁধা। দু'জন ছেলেকে দেখ্‌লুম রুটি চিবোতে চিবোতে পথ চল্‌ছিল। রাস্তায় যত ছেলেমেয়ে দেখি সকলের পিঠে একটি পোঁটলা বা ব্যাগ বাঁধা।

সাইকেল জার্মেনীর সব শহরে এত বেশী যে সাইকেলের চাপে মারা পড়্‌বার ভয়। এক সঙ্গে পঞ্চাশ ষাট্‌খানা সাইকেলে সব বয়সের মেয়েপুরুষ রাস্তা জুড়ে চলে।

কোলোনের মতো এখানেও গির্জা ও মিউজিয়াম অনেক। মিউজিয়ামে এত দেশের এত বড় বড় শিল্পীর ছবি থাকে যে কেবল একবার দেখে এলে কত শিক্ষা, কত আনন্দ হয়। যারা ভালো করে ছবি আঁকা শিখ্‌তে চায় তারা মিউজিয়ামের ছবির কাছে বসে ছবির নকলে আঁকে। অনেক বুড়ো-বুড়ীকে পর্যন্ত এই কাজ কর্‌তে দেখেছি লণ্ডনে ও প্যারীতে। বটানিক্যাল গার্ডেনে কন্‌সার্ট শুন্‌লুম। অনেকে সেখানে টেনিস্‌ও খেল্‌ছিল। ছোট ছেলেমেয়েতে বাগানটা ভরে গিয়েছিল। একটা ছেলে মেয়েদের মতো shingle করেছে দেখে হাসি পেল। জার্মেনীতে এক কালে ছেলেরাও ঝুঁটি বাঁধত। Beethoven ও Goethe ছেলে বয়সে ঝুঁটি বাঁধতেন। এখন কিন্তু জার্মানরা সাধারণত নেড়া! তারা ক'বার বেলতলায় যায়? এই শহরেই Goethe-র জন্ম। তাঁর বাড়ী দেখলুম। বাড়ীটি সেকালের মতো করে সাজানো।

মেইন নদীর কূলে এই শহর। নদীর এক একটা অংশ ঘেরাও করে গোটা কয়েক swimming bath করা হয়েছে।

তার দেয়ালগুলোতে ছবি আঁকা। তাতে সারাক্ষণ কন্‌সার্ট্ চলে। গান ও ছবির আবহাওয়ায় খোলা আকাশের তলে খোলা বাতাসে যারা সাঁতার কাটে, তাদের কেউ বা বৃদ্ধ কেউ বা বালিকা। প্রায় সকলেরই গা খালি। সাঁতারের পরে তাদের কেউ কেউ skip করে, কেউ কেউ বল্ খেলে, কেউ কেউ কুস্তি লড়ে এবং অনেকে এক একখানা তক্তার উপরে শুয়ে রোদ পোহায়। এসব swimming bath তৈরি করে দেওয়া হয়েছে ম্যুনিসিপালিটী থেকে।

জার্মেনীর ম্যুনিসিপ্যালিটীগুলোর নিজেদের ট্রাম আছে। ম্যুনিসিপালিটীর টাকায় অপেরা হাউস ও থিয়েটার চলে। ম্যুনিসিপ্যালিটীর বাড়ীর নিচের তলায় ভোজনাগার করে দেওয়া হয়েছে, তাতে শস্তায় ভালো খাবার দেওয়া হয়। এই সব ভোজনাগার দু'তিনশো বছর ধরে চলে আস্‌ছে। আজ এক অন্ধকে দেখেছিলুম, তার সঙ্গে এক ক্রস্‌চিহ্নিত কুকুর। সেই কুকুর তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

* * *

Heidelberg

হাইডেলবার্গের বিশ্ববিদ্যালয় ৬৫০ বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত। জার্মেনীতে বহুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কিন্তু হাইডেল্‌বার্গ সব চেয়ে রোমান্টিক। জার্মেনীর একটি প্রসিদ্ধ গানের প্রথম কথা "হাইডেল্‌বার্গে আমি হৃদয় হারিয়েছি।" নেকার নদীর কূলে দুটি পাহাড়ের পাদদেশে এই ছোট শহরটির অবস্থিতি, পাহাড়ের উপরে এক বৃহৎ দুর্গ ও উদ্যান।

হাইডেল্‌বার্গেও দেখলুম তেমনি স্যুইমিংবাথ, তেমনি দাঁড় টানা, তেমনি ঘাসের উপরে খোলা গায়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে সূর্যালোক অনুভব, তেমনি পক্ষী-পক্ষিনীদের দল (Wander-vogel)। সারা জার্মেনী যেন ক্ষেপে গেছে! বুড়ো-বুড়ীরা বাধা দেবে কোথায়, না, বুড়োবুড়ীরাই অগ্রণী। দেশের দুঃখ আবালবৃদ্ধবনিতার মর্মে বিঁধেছে। তরুণে প্রবীণে গালাগালি দলাদলির অবসর নেই। দুর্গম পথে ছেলেদের নেত্রী হয়েছে এক বুড়ী, তার পিঠে বস্তা। পাঁচ বছরের খোকাখুকী নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, গুরুজন দাঁড়িয়ে দেখছেন।

* * *

Wurzburg
৮ই সেপ্টেম্বর

এটি একটি প্রাচীন ছোট শহর। জার্মেনীর প্রত্যেক শহরে অধিকাংশ গ্রামে ট্রাম আছে। তোমরা যখন জার্মেনী আস্‌বে তত দিনে সমস্তটা জার্মানী ট্রামে করে ঘোরবার উপায় হয়ে থাক্‌বে।

এখানকার জার্মানরা দেখছি পেয়ালা পেয়ালা নয়, গেলাস গেলাস নয়, ঘড়া ঘড়া বিয়ার খায়। জলও আমরা এত খেতে পারিনে, পেট ভরে যায়। এখানে সেকালের এক মোহান্ত মহারাজের (Prince Bishop) প্রাসাদ আছে, এখন সেটা জাতীয় সম্পত্তি। প্রাসাদটি মহারাজের সৌন্দর্য-প্রিয়তার নিদর্শন চিত্রে ভাস্কর্যে বাস্তুকলায় বহন করছে।

এখানেও একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, এটি চিকিৎসা-বিদ্যার জন্যে প্রসিদ্ধ।

এখানেও Wandervogel ও সাঁতার দাঁড় টানার রেওয়াজ। আরেকটা রেওয়াজ ছবি আঁকার। প্রৌঢ়া Nunরা পর্যন্ত কাগজ ক্রেয়ন নিয়ে বসে গেছেন।

একটা হাট দেখলুম। হট্টগোল বাদ দিলে ঠিক্ আমাদের হাট। শাকসবজীওয়ালী বুড়ীদের কেউ কেউ শাকসবজীর ঝুড়ি নিয়ে গির্জায় বসে মনস্কামনা জানাচ্ছিল। আরেকটি গির্জায় কতগুলি মনোযোগী বালক-বালিকা আচার্যের কাছে ধর্মশিক্ষা করছিল।

জার্মেনী—বাভেরিয়া

মিউনিক

যেখানে বসে লিখ্ছি, সেটা একটা কাফে। ফ্রান্সের ও জার্মেনীর গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে কাফে আছে। যদিও সব সময় সেখানে চা কিম্বা কফি কিম্বা শোকোলা (Chocolat) কিম্বা হাল্কা মদ খেতে পারা যায় তবু বাড়ীতে কিম্বা রেস্তরাঁয় রাত্রের খাবার শেষ করে কাফেতে এসে সন্ধ্যা বেলা সবাই বসে। তারপর এক পেয়ালা কফি কিম্বা আর কিছু নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে, গল্প করে, দাবা খেলে, তাস খেলে, নাচে, গান ধরে, Concert শোনে। সব রকম লোকের জন্যে সব রকম কাফে আছে—ছাত্রদের কাফেতে তারা চা খেতে খেতে বই পড়্তে পারে। অবশ্য কেবল বই পড়তে কেউ আসে না, মাঝে মাঝে ইয়ার্কি দিতে ও নাচ্তেও আসে। মজুরদের কাফেগুলিতে মহা হৈ চৈ হয়, তারা দিনে খেটে খুটে এতটা শ্রান্ত হয়ে আসে যে ঘড়া ঘড়া বিয়ার খেয়েও তাদের স্ফূর্ত্তি থামে না। এখানে একটা প্রসিদ্ধ বিয়ার হল আছে—ম্যুউনিসিপালিটি থেকে তৈরি করে দেওয়া। তার নিচের তলায় মজুর-মজুরনীদের আড্ডা, মাঝের তলায় ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাদের, শেষের তলায় কোনো উৎসব রজনীতে সমবেত সাধারণের। বিরাট ব্যাপার, এক একটা ঘরে হাজার দু'হাজার বস্বার জায়গা।

আমাদের এই কাফেটাতেও শ'তু'য়েক লোকের উপযুক্ত চেয়ার টেবিল। আমি যদি ইচ্ছা করি তো এখানে বসে চার ঘণ্টা ধরে চিঠি লিখতে পারি, Concert শুন্‌তে পারি, অথচ এগারো বারো আনার বেশী খরচ নাও কর্‌ত পারি। পারীর কাফেগুলো আরো অনেক সস্তা, তবে কন্‌সার্ট-ওয়ালা কাফেতে খরচ আরো বেশীও হয়। পারীতে অসংখ্য কাফে—কত লোক সে সব কাফেতে কাজ করে খাচ্ছে। কাফেগুলোর দৌলতে কত গায়ক বাদকের অন্ন হয় একবার ভেবে দেখো। এমন সব কাফে আছে যেখানে প্রধানতঃ আর্টিস্টরা যায়। সে রকম জায়গায় কত রকম ভাবের আদান প্রদান হয়। এক একটা কাফে যেন এক একটা সভা সমিতি। চাইলেই খবরের কাগজ পড়তে দেয়, কাজেই reading roomও বলতে পারো। আমাদের চায়ের দোকান-গুলোকে কাফেতে পরিণত কর্‌লে বেশ হয়।

মিউনিককে জার্মানরা বলে ম্যুইন্‌শেন্‌। এর কথা বলবার আগে তোমাদের বলি Dinkelsbuhl-এর কথা। ওটি এই বাভেরিয়ারই একটি ছোট্ট শহর। কিছু দিন আগে ওর সহস্র বার্ষিকী হয়ে গেল। এই এক সহস্র বৎসর ঐ ছোট্ট শহরটিকে ঠিক্‌ একই রকম রাখা হয়েছে, ওর আশেপাশের কোনো জায়গার সঙ্গে আর ওর মেলে না। পুরোনো বাড়ী ভেঙে গেলে পুরোনো রীতিতে গড়ে দেওয়া হয়, পুরোনো রাস্তা মেরামত হয় পুরোনো পদ্ধতিতে। তবে জল—আলো—স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি একালের মতো। ওখানে অনেকগুলি

চার-পাঁচ তলা গম্বুজ (Tower) আছে, তাতে মানুষ থাকে। যে টাওয়ারটিতে উঠেছিলুম সেটির সব উপরের তলায় ছিল এক ছোট খুকী আর তার মা বাবা। মনুমেণ্টের মতো উঁচু টাওয়ার, কাজেই খুকীকে সাবধানে রাখতে হয়। নিচের একটি তলায় ছিল এক ভ্রাম্যমান আর্টিস্ট আর তার সঙ্গিনী। তারা বার্লিন থেকে ছবি আঁক্‌তে আঁক্‌তে দেশ দেখতে দেখতে এসেছে, Dinkelsbuhlএর ছবি দু'জনে আঁক্‌ছিল। তাদের সম্বল মাত্র তাদের পিঠের পোঁট্‌লা (জার্মান ভাষায় বলে rucksack)। তাদের খাওয়া-পরা খুব সাদাসিধে —মেয়েটির পরণে রঙীন খদ্দর আর ছেলেটির খাকী হাফ-প্যাণ্ট ও শার্ট। ইংলণ্ডে এ সব অচল।

Dinkelsbuhlএ যে হোটেলে ছিলুম সে হোটেলের মালিকের মতো আমুদে লোক অল্পই দেখেছি। লোকটি ইংলণ্ডে দশ এগারো বছর ছিল, যুদ্ধের সময় তাকে Isle of Manএ অন্তরীন করে রাখা হয়। যুদ্ধের পরে ছাড়া পেয়ে সে দেশে ফিরে হোটেল খুলেছে, কিন্তু যুদ্ধে তার যথা সর্বস্ব বিশ হাজার টাকা লোকসান যায় বলে এখনো একবার ইংলণ্ডে গিয়ে তার আধা ইংরেজ মেয়েদুটিকে দেখে আসতে পার্‌ছে না। সে আমাদের রবীন্দ্রনাথের একজন ভক্ত আর গান্ধীকেও খুব ভালোবাসে। কুস্তীগীর গামা, ইমাম-বক্স ও কার্‌লার সঙ্গে তার লণ্ডনে ভাব হয়েছিল। সে একবার ভারতবর্ষে যেতে চায়, কিছু টাকা জমালে পরে। লোকটি এমন চমৎকার গাইতে বাজাতে ও আসর জমাতে পারে যে

শুধু সেই জন্যই অনেক লোক তার ওখানে খেতে আসে, জার্মেনীর একালের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর পর্যন্ত।

মিউনিক বিয়ারের জন্যে, ছবির জন্যে ও আস্‌বাবের জন্যে বিখ্যাত। শহরটি জার্মান ক্যাথলিকদের প্রধান আড্ডা। সুন্দর শহর। ক্যাথলিকরা সৌন্দর্যপ্রিয়।

মিউনিকের মিউজিয়ামগুলির একটির নাম Deutsch Museum অর্থাৎ জার্মান মিউজিয়াম। ভালো করে সেটি দেখ্‌লে বিজ্ঞানের সব কথা চুম্বকে জানা যায়। আদিম মানুষ কী রকম ভাবে বাস কর্‌ত সেকথা বোঝানো হয়েছে কৃত্রিম গুহা নির্মাণ করে ছবি এঁকে। কয়লা কেমন করে পাওয়া যায় সে জন্যে একটি আস্ত খনি তৈরি হয়েছে, সেই খনির ভিতরে নেমে গেলে মনে থাকে না যে এটা খনি নয় মিউজিয়াম। কৃত্রিম লোহার কারখানা, কেমিস্টের ল্যাবরেটরী, এরোপ্লেনের ক্রমোন্নতি, ছাপাখানার ক্রমোন্নতি, রেডিয়ামের আলো, ইলেক্‌ট্রিসিটির লীলা, সেণ্ট্রাল হীটিং কেমন করে হয়, কাপড় তৈরির আদি অন্ত, কলের সাহায্যে গো-দোহন, কোন খাদ্যে কত সার আছে, এই রকম কত ব্যাপার যে সে বৃহৎ মিউজিয়ামটাতে আছে তা দিনের পর দিন দেখলেও শেষ হয় না, সে কথা আমি লিখলেও শেষ হবে না।

এসব দেখতে লাখলাখ ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ী যায়; nunরা পর্যন্ত মেয়ের দলকে Blast furnace-এর তত্ত্ব বুঝিয়ে দেয়; দেশের সকলেই বিজ্ঞানের উন্নতিতে আগ্রহ

দেখায়। আমরা যেমন হরি নাম জপ করি এরা তেমনি বিজ্ঞানের নাম জপ করে।

আরেকটা মিউজিয়ামে সেকালের পোশাক, আস্‌বাব, অস্ত্র, ইত্যাদি শতাব্দী অনুসারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর লোক কেমন ঘরে থাক্‌ত, কেমন খাটে শুতো, কী কী পোশাক পর্‌ত, কেমন তাদের গহনা, কেমন তাদের বর্ম—এসব জান্‌তে চাইলে এই মিউজিয়ামে যেতে হয়। থিয়েটারওয়ালারা এ সব দেখে অভিনেতা অভিনেত্রীদের সেকালের মতো করে সাজায়। এ রকম মিউজিয়াম কোলোনেও আছে।

চিত্রশালা মিউনিকে অনেক। একটাতে প্রাচীনদের ছবি, আরেকটাতে আধুনিকদের ছবি। আরেকটাতে অত্যাধুনিকদের ছবি। প্রতি বছর প্রায় হাজার দু' তিন নূতন ছবি শেষোক্ত চিত্রশালাটিতে প্রদর্শিত হয়। এক মিউনিকেই এই। সমগ্র জার্মেনীর চিত্রকরেরা বছরে ক' হাজার ছবি আঁকেন? অসংখ্য লোক ছবি আঁকে, আরো অসংখ্য লোক প্রসিদ্ধ ছবি নকল করে। ছবি নকল করাও ভারি শক্ত কাজ, সে জন্যে তারা মজুরিও পায় যথেষ্ট, কেননা ধনীরা সে সব নকল ছবি কিনে নিয়ে ঘর সাজায়! ছবি নকল করার কাজে মেয়েরাই যায় বেশী। সেই তাদের জীবিকা।

মিউনিকে এখন একটি প্রদর্শনী বসেছে, শীঘ্রই একটা মেলা বস্‌বে। প্রদর্শনীটি কোলোনের মতো বড় না হলেও

বেশ বড়। এরও একটি ছোট্ট রেল্‌গাড়ী, নাগরদোলা, খাবার ঘর, পুতুল-থিয়েটার ইত্যাদি আছে। প্রদর্শনীটি গৃহ রচনা বিষয়ক। অল্প খরচে কত রকম বাড়ী তৈরি কর্‌তে পারা যায়, কী কী আস্‌বাবে তাকে সাজাতে পারা যায়, ছেলের ঘর কেমন হবে, মেয়ের ঘর কেমন হবে, রোগীর ঘর কেমন হবে, খাবার ঘর কেমন হবে, এই সকলের নমুনা দেখানো হয়েছে। ইলেক্‌ট্রিক ঝাঁটা, ইলেক্‌ট্রিক উনুন, ইলেকট্রিক্ চিকিৎসা, স্নান যন্ত্র, ডিম তাজা রাখ্‌বার যন্ত্র, খাবার তাজা রাখ্‌বার উপায়, শিশুর নতুন ধরণের খেলাঘর, সাদাসিধে অথচ নতুন ধরণের চেয়ার টেবিল খাট বিছানা কৌচ দেরাজ, এমনি অনেক জিনিস সেখানে দেখে নিয়ে ব্যবহারে লাগানো যায়। ঘর সাজানো ইউরোপে একটা আর্ট্ রূপে গণ্য। এ সম্বন্ধে অনেক মাসিকপত্র চলে। গৃহিণীরা তাই পড়ে কোন জিনিসটি কোন জায়গায় রাখ্‌তে হবে তাই শেখেন এবং আস্‌বাব পত্র ফ্যাসান অনুসারে বদ্‌লান। এখন আন্দোলন চলেছে আস্‌বাব পত্র সাদাসিধে অথচ মজ্‌বুৎ এবং পরিপাটী কর্‌তে। একটা ঘরে গুণে গুণে মাত্র গোটাকয়েক আস্‌বাব রাখতে হবে, ঘরে ঢুক্‌লেই যেন মনে হয় এটা গুদাম নয় এটা আলো হাওয়ায় ভরা খেলার মাঠের মতো ফাঁকা জায়গা। জার্মানরা এখন সূর্যোপাসক হয়েছে। সূর্যের উপরে লেখা মাসিক পত্র অনেক, তাতে সূর্যের আলো থেকে স্বাস্থ্য ও শক্তি সংগ্রহের কথা থাকে। ছোট ছেলেমেয়েদের এখন খালি পায়ে খালি গায়ে খেল্‌তে

দেওয়া হয়। খালি পায়ে জল ঘাঁট্‌তেও অনেক ছেলেকে দেখেছি।

প্রদর্শনীতে দেখলুম সমগ্র জার্মেনীতে "উড়ো পাখী"দের জন্যে প্রায় আড়াই হাজার বাসা আছে, সেখানে প্রায় পঁচিশ লাখ পক্ষি-পক্ষিনী রাত কাটাতে পারে। সারাদিন পায়ে হেঁটে বেড়াবার পর সন্ধ্যাবেলা একটা বাসায় উঠে রেঁধে খাওয়া, আর গান গল্প বিশ্রাম। ভোরে উঠে আবার অচিন বাসার অভিমুখে রওনা হওয়া। এমনি করে ছুটি কাটে। ছুটিতে কেউ বাড়ী থাকে না। এই সব বাসা যৌবন-আন্দোলনের কর্ত্তৃপক্ষরা চালান। আমাদের যদি যৌবন-আন্দোলন কর্‌তে হয় তবে প্রথমে নিজের নিজের জেলার মধ্যেই কর্‌তে হবে। ধরো, একটা জেলায় যতগুলো ইস্কুল আছে প্রত্যেকের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত হবে যে কোনো একটা ইস্কুলের ছেলেরা বেড়াতে বেরিয়ে সন্ধ্যাবেলা যে গ্রামে পৌঁছবে সেই গ্রামের ইস্কুলের মাঠে রান্না কর্‌বে ও ইস্কুলের বারাণ্ডায় শোবে। সেই ইস্কুলের ছেলেরা যদি বাড়ী থাকে তো অভ্যাগতদের দেখবে শুনবে সাহায্য কর্‌বে। দুই পক্ষে বন্ধুতা হবে। নিজের জেলার সকলের সঙ্গে ভাব হলে পরে দেশের সকলের সঙ্গে ভাব। সেটাও যখন শেষ হবে তখন বিদেশের সকলের সঙ্গে ভাব।

মিউনিক, ১৩৩৫

হাঙ্গেরী

মিউনিকের কাফেতে যে চিঠি শুরু করেছিলুম সে চিঠি আজ বুডাপেস্টের কাফেতে বসে শেষ করছি। ইতিমধ্যেই ভিয়েনায় দিন কয়েক কাটিয়ে এলুম। ভিয়েনা খুব বড় শহর, আগে ইউরোপের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ছিল, এখন চতুর্থ বৃহত্তম শহর। বলো দেখি, এখনকার তৃতীয় বৃহত্তম শহর তবে কোনটি? প্যারিস্। দ্বিতীয়? বার্লিন।

লোকসংখ্যা কমে গেছে, সে সমৃদ্ধিও আর নেই। বড় বড় প্রাসাদের মতো বাড়ী পড়ে রয়েছে, কিন্তু অত বড় পুরীতে মাত্র আঠার লাখ লোক। আগে ভিয়েনা ছিল বিরাট অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের রাজধানী, এখন অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী ভেঙে চারটে রাজ্য হয়েছে এবং আরো তিনটে রাজ্যকে ভাগ দেওয়া হয়েছে। অস্ট্রিয়ার চেহারা এখন ভাঙা বাড়ীর মতো। এমন দেশে ভিয়েনাকে আর মানায় না।

রাজপ্রসাদগুলোকে এখন মিউজিয়ামে. পরিণত করা হয়েছে। সবশুদ্ধ চল্লিশের বেশী মিউজিয়াম আছে ভিয়েনায়। স্টেট থিয়েটার আর স্টেট অপেরা আগের মতোই চলছে, আরো অনেক থিয়েটার সিনেমা ও নাচঘরও চলছে। হোটেল রেস্তঁরা ও কাফে অনেক আছে, লোক হয় না বেশী। সেই জন্যে সেগুলো বেশ সস্তা। রান্নার জন্যে ভিয়েনা আগে যেমন অতুলনীয় ছিল এখনো তেমনি। অস্ট্রিয়ানরা

এখন বেশীর ভাগ সোশ্যালিস্ট হলেও আগের মতো কায়দা দুরস্ত ও জঁাকালো। পুলিশম্যানের সাজ যেন সেনাপতির সাজ, তরোয়ালটি কোমরে ঝুলছে। কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে গেলেই সেলাম ঠোকে। এটা জার্মান পুলিশ মাত্রেরই স্বভাব। তারা ভারি বিনয়ী। অস্ট্রিয়ানরাও জার্মান। জার্মেনীতে সাধারণতঃ বাস নেই, ভিয়েনায় অল্প।

ভিয়েনার রাজবাড়ীগুলো চমৎকার। কয়েক বছর আগে যেখানে সম্রাট-সম্রাজ্ঞী ছাড়া আর কারুর পা পড়্‌ত না এখন সেসব সকলেরই সম্পত্তি। সম্রাজ্ঞীর বাগানবাড়ীতে এখন রাস্তার ছেলেমেয়েরা খেলা কর্‌তে যায়। বাগানবাড়ীর এক একটা ঘরে এক এক দেশের ছবি কঁাচের দেয়ালের ভিতর থেকে অঁাটা। একটা ঘরে কেবল চীনা ছবি, একটা ঘরে কেবল জাপানী ছবি, এবং যে ঘরটা বানাতে দশ লাখ টাকা লেগেছিল সে ঘরটাতে হিন্দু মুসলমান ছবি। এসব দেড়শো বছর আগে সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসার কীর্ত্তি। ভিয়েনার সর্ব্বত্র মেরিয়া থেরেসার প্রভাব। অস্ট্রিয়ার রাজবংশ ছিলেন ইউরোপের সবচেয়ে বনেদী রাজবংশ। প্রায় সাতশো বছর ধরে তাঁরা ভিয়েনার শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন, গত মহাযুদ্ধে তাঁদের পতন হলো। এখন অস্ট্রিয়া গণতন্ত্র ও ভিয়েনার লোক সোশ্যালিস্ট। নতুন বাড়ীও তৈরি হচ্ছে, সে সব বাড়ী খুব নতুন ধরণের। তাদের দেয়ালগুলো বইয়ের শেল্‌ফের মতো দেখতে। ইউরোপে প্রতি দিন নতুন ধরণের বাড়ী তৈরি, নতুন ধরণের বাড়ী সাজানো, নতুন ধরণের আলো-

উত্তাপ-জলের ব্যবস্থা। ইউরোপ নিত্য নূতন। ভিয়েনাতেও একটা বাড়ী সাজানোর প্রদর্শনী চল্‌ছে। দেখে ধন্য ধন্য কর্‌তে হয় শিল্পীদের।

মিউনিকের রাজবাড়ীও এখন সাধারণের সম্পত্তি। রাজবাড়ীগুলোতে ছবি ও মূর্তি আছে অসংখ্য। রাজারা শিল্পদ্রব্যের কদর বুঝ্‌তেন। তাঁদের সংগৃহীত শিল্পদ্রব্য দেখ্‌তে দেশবিদেশের লোকে আসে, কিন্তু তাঁরা আস্‌তে পারেন না। মিউনিকের ও ভিয়েনার গড়ন ভারি সুন্দর, পারী ছাড়া খুব কম শহরের গড়ন এত ভালো। এও সেই রাজাদের গুণে। স্টেট্ অপেরা ও স্টেট্ থিয়েটারগুলোও তাঁদের সৃষ্টি।

ভিয়েনা শহরটি পাহাড়ে ঘেরা Danube নদীর কূলে। শহরের মাঝখানে বৃত্তাকার একটা রাস্তা। এই রাস্তাটাকে বলে "Ring"। এমন সুন্দর ও এমন দীর্ঘ রাজপথ পৃথিবীর কোথাও নেই বোধ হয়। রাজপথের দুই ধারে তরুবীথি। ফ্রান্সে ও জার্মেনাতেও এই রকম।

ভিয়েনাকে সেখানকার লোকে বলে ভিন্ (Wien) আর Danubeকে বলে ডোনাউ (Donau)। নদীটি ক্রমশ চওড়া হতে হতে এই Budapestএ কল্‌কাতার গঙ্গার চেয়েও চওড়া হয়েছে। নদীর দুই ধারে শহর। মাঝখানে দ্বীপ। এক পাশে পাহাড়। পাহাড়ের উপর সুন্দর সুন্দর বাড়ী। রাস্তায় রাস্তায় গাছ। আমি একটা গাছের কাছে বসেই লিখ্‌ছি খোলা আকাশের তলে ফুটপাতের একাংশে। মেঘ্‌লা রাত।

হাঙ্গেরীর লোক ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোকের থেকে জাতে পৃথক—এরা মঙ্গোলিয়ান বংশীয় ম্যাগিয়ার (Magyar)। কিন্তু হঠাৎ দেখ্‌লে বোঝা যায় না। খুব খুঁটিয়ে দেখ্‌লে ধরা পড়ে—এদের চোখ ও ভুরু কতকটা চীনাদের মতো। কিন্তু নাক আর রঙ্ ইউরোপীয়দের মতো। হাঙ্গেরীর শহরের লোকেরা সব বিষয়ে ইউরোপীয় হয়েছে বটে, কিন্তু পাড়া-গেঁয়েরা এখনো মুসলমানদের মতো আছে। তাদের মেয়েরা ঘাগ্‌রা পরে, মাথায় রঙীন ওড়না বাঁধে। আর পুরুষেরা ঢিলে পোশাক পরে। হাঙ্গেরীর লোক তুর্কীর লোকের মাস্‌তুতো ভাই, বহুকাল তুর্কীর অধীনেও ছিল। বোধ হয় সেই সব কারণে এরা কতক বিষয় ইউরোপের লোকের উল্টো। এরা বলে "রায় শঙ্কর অন্নদা", ১৯২৮, সেপ্টেম্বর, ১৮ই।*

হাঙ্গেরী এখন অস্ট্রিয়ার থেকে ভিন্ন হয়েছে, এটাও এখন গণতন্ত্র। তবে এখানে জমিদারদের প্রভাব বেশী।

বুড়াপেস্টে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর ৺সম্রাটের প্রাসাদ আছে। বৃহৎ প্রাসাদ, পাহাড়ের উপরে। মিউজিয়াম যেমন সর্বত্র তেমনি এখানেও। স্টেট্ অপেরা ও স্টেট্ থিয়েটারেও তেমনি। হাঙ্গেরিয়ানদের সঙ্গীত ইউরোপ-প্রসিদ্ধ। হাঙ্গেরিয়ানরাও ক্যাথলিক। এখানে তাদের অনেক প্রাচীন গির্জা আছে।

---

* আমরা বলি ৭॥ টা (সাড়ে সাতটা)। এরা বলে ½৮টা (আধ আটটা)।

হাজার খানেক বছর আগে হাঙ্গেরীর লোক খ্রীস্টান হয়ে যায়। যে দিন তারা খ্রীস্টান হয়েছিল সেই দিনটার স্মৃতি উৎসব প্রতি বছর হয়। তখন তারা একটা ঘোড়া বলি দেয়।

ইংলণ্ড থেকে যতই পূর্ব দিকে আস্‌ছি ততই আমাদের দেশের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখ্‌ছি। স্টেশনে হাঁক ডাক, থিয়েটারে হৈ চৈ, রাস্তায় সোরগোল ক্রমে বাড়্‌ছে। পোশাকও সাদাসিধে—মজুরদের খালি গা, গরীবের ছেলেদের খালি পা। পিঠে ঘাসের বোঝা বা কাপড়ের বোঁচকা বেঁধে মেয়েরা চলেছে।

বুডাপেস্ট, ১৩৩৫

অস্ট্রিয়া

আবার ভিয়েনায় এলুম। ভিয়েনার মায়া কাটানো শক্ত। ওরকম একটি সুন্দর শহরে অন্ততঃ মাস তিনেক থাকতে হয়, তা নইলে অতৃপ্তি থেকে যায়। রাতের ভিয়েনা একটা দেখ্‌বার জিনিস। প্রত্যেক রাত্রেই দেয়ালি। ভিয়েনার কাছে ও দূরে অসংখ্য পাহাড়। সে সব পাহাড়ের কোথাও কোথাও পুরোনো তীর্থ আছে, সেখানে দিগ্‌দিগন্তের যাত্রীরা এসে ধন্না দেয়, মানৎ করে। আগাগোড়া হিঁদুয়ানী। আধ্যাত্মিক বলে আমাদের ঐ অহঙ্কারটা এ সব দেখে শুনে রীতিমতো ঘা খায়। যদি আমেরিকায় যাও তো fundamentalistদের দেখে কখনো মনে হবে না যে ওরা কুসংস্কারে আমাদের গুরু হবার অযোগ্য। আমেরিকার এক জগদ্‌গুর্বী সম্প্রতি এই লণ্ডনে ভয়ঙ্কর বক্তৃতা দিয়ে পাপীতাপীদের উদ্ধার করছেন—ভীষণ ভীড়। কাল Chaliapineএর গান ও Rubinowitshএর বাজ্‌না শুনে রয়াল এলবার্ট হলের বাইরে এসে দেখি হাজার দশেক লোক স্বর্গে যাবার জন্যে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে। হায়, হায়, তখন আমার এমন ক্ষিদে পেয়েছিল যে পকেট হাৎড়ে এক আধখানা চকোলেট বা টফী যদি পেতুম তবে ওদের দলে ভিড়ে যেতুম, এমন সুযোগ ছাড়্‌তুম না।

ভিয়েনা থেকে অস্ট্রিয়ান টিরোল্‌ দিয়ে সুইটজারল্যাণ্ডে আসি। টিরোলের মতো সুন্দর প্রদেশ ইউরোপে আছে

কি না জানি নে। যতদূর চোখ যায় কেবল পাহাড় আর হ্রদ আর সমতল মাঠ। পাহাড়ে বরফ জমেছে, মেঘ ঘিরেছে, বৃষ্টি নেমেছে; হ্রদের জল স্বচ্ছ, একটি দুটি নৌকা ভাস্‌ছে, মাঠের কোণে চাষার কুটীর, অচেনা ফুল, অজানা ফসল। চাষার মেয়েরা ট্রেনে উঠ্‌ছে, ট্রেনে বসে গান ধরেছে, সেলাই কর্‌ছে। চাষারা ট্রেনে উঠেই নমস্কার কর্‌ছে সবাইকে, নেমে যাবার সময় নমস্কার পাচ্ছে সকলের কাছে। রেলের লোক টিকিট দেখ্‌বার জন্যে এসে কাছে বসে দু'দণ্ড গল্প করে যাচ্ছে, হাসি ঠাট্টায় যোগ দিচ্ছে। রেলও তেমনি দিলদরিয়া মেজাজে টুক্ টুক্ করে চলেছে, এমন সুন্দর পথটা সে এক নিঃশ্বাসে কাটিয়ে যেতে চায় না। তাড়া কিসের? এমন সুন্দর জগৎ, এখান থেকে পালিয়ে মর্‌বো কোন স্বর্গে? টিরোলের ভিতর দিয়ে আস্‌বার সময় একটুও ইচ্ছা কর্‌ছিল না চোখ দুটোকে নড়াতে কিম্বা বুঁজ্‌তে।

যে গ্রামে সন্ধ্যা হলো সেই গ্রামে নেমে পড়া গেল। গ্রামটা বড়, নাম Bishopspofen। গোটা চার পাঁচ হোটেল আছে, সিনেমা ও নাচঘর তো আছেই। পরিষ্কার মজ্‌বুৎ রাস্তা, বাড়ীগুলো ঘন নিবিষ্ট। ইউরোপের গ্রামগুলো বাস্তবিক বড় আরামের। শহরের সব সুবিধার সঙ্গে গ্রামের সব সুখ মিশিয়ে যা হয় তাই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত —সেকেলে গ্রাম বা একেলে শহর কোনোটাই কাম্য নয়। ইলেকট্রিকের আলো ও উনুন, সেন্ট্রাল হীটিং, টেলিফোন ও রেডিও—ইউরোপে যে কোনো বড় গ্রামে এ গুলি আছে।

তারপর আছে কাফে, রেস্তরাঁ, যেমন সর্বত্র থাকে। মাঝে মাঝে গান বাজনার সঙ্গত হয়, যাত্রা পার্বণের বিজ্ঞাপনও চোখে পড়ল। গির্জা তো থাক্‌বেই।

গ্রামটা পর্বতবেষ্টিত। ঐ অঞ্চলের সব গ্রামই ঐ রকম।

পরদিন ইন্‌স্‌ব্রুক দিয়ে সুইটজারল্যাণ্ডে প্রবেশ করলুম। সুইটজারল্যাণ্ডকে আর নূতন মনে হলো না। কেন যে লোকে অস্ট্রিয়ান টিরোলে না গিয়ে সুইটজারল্যাণ্ডে ছোটে ভেবে কারণ পেলুম না, সম্ভবত লোকে এখনো অস্ট্রিয়ান টিরোলের স্বাদ পায় নি। এবং সম্ভবত লোকে জনাকীর্ণ অঞ্চলে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গ পেতেই বেশী ভালোবাসে। সুইটজারল্যাণ্ডে এখন হাট বসেছে, ছুনিয়ার যে যেখানে ছিল সবাই এসে জুটেছে—কেউ স্বাস্থ্যের জন্যে, কেউ আমোদের জন্যে, কেউ জীবিকার জন্যে এবং কেউ শিক্ষার জন্যে।

সুইটজারল্যাণ্ডের লুসার্ণ শহরটি ছোট, কিন্তু একখানি ছবির মতো সুন্দর। যে হ্রদের ধারে তার স্থিতি, সে হ্রদটি নদীর মতো আঁকা বাঁকা অথচ সমুদ্রের মতো দিগন্ত জোড়া। হ্রদের চারিদিকে পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় বরফ। মেঘের ফাঁক দিয়ে যখন সূর্য উঁকি মারে তখন পাহাড় আর হ্রদ কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখ্‌ব ঠিক কর্‌তে পারি নে। জোর করে চোখ বুঁজে ধ্যানের মতো ভাবি, মায়া, সব মায়া।

লুসার্ণের কাছটা নাকি অতীত কালে একটা সমুদ্র ছিল, তার পরে সমুদ্র সরে গেলে সেখানে বড় বড় সব glacier

উঁচু থেকে নামত আর পাথরের ভিতরে গর্ত রেখে যেত। সেকালের সেই সব চিহ্ন লুসার্ণের একটা জায়গায় আছে।

ইণ্টারলাকেনও একটা ছোট শহর, তার দু'পাশে দুটো হ্রদ এবং চারিদিকে পাহাড়। শহরটা লুসার্ণেরই মতো হোটেলে ভরা। সুইজটজারল্যাণ্ডে হোটেল ছাড়া বড় কিছু নেই। সেই সব হোটেল চালিয়ে বিদেশীদের টাকায় সুইস্‌রা বড় মানুষ। সুইস্‌দের মধ্যে ভিখারী বা বেকার তো নেইই, খুব বড় লোকও নেই।

বার্ণ্ শহরটি সুইট্‌জারল্যাণ্ডের রাজধানী, তা তো জানোই। ঐ অঞ্চলে এক কালো ভালুক ছিল—সেই থেকে অঞ্চলটির নাম (জার্মান ভাষায়)—"ভালুক"। এখনো বার্ণে গোটা কয়েক ভালুক আছে। শহরের সব জায়গায় ভালুকের মূর্তি বা ছবি দেখা যায়, পতাকাতেও ভালুক। বার্ণের রাস্তাগুলোর দু'পাশে যে ফুটপাথ আছে সে ফুটপাথের ছাদ থাকায় বড় সুবিধা হয়েছে, রোদ জলের ভয় নেই। বার্ণের এটা বিশেষত্ব।

বার্ণে এখন একটা প্রদর্শনী বসেছে, বৃহৎ প্রদর্শনী, কোলোনের "প্রেসা"র চেয়ে কিছু ছোট। প্রদর্শনীতে সুইস মেয়েরা কত রকম কাজ করে থাকে তারই একটা আভাস দেওয়া হয়েছে। বোঝা গেল মেয়েরা ঘরের ও বাইরের কোনো রকম কাজে পেছপাও নয়, তারা চাষও করে, বাগানও করে, কারখানাও চলায়, ডাক্তারখানাও চালায়। মেয়েরাও যে দেশে শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন করে সে দেশের শিল্প-দ্রব্য বিদেশে

সস্তায় বিক্রী হতে পারে, সুতরাং বিদেশের বাজার দখল করে। যেমন জাপান আমাদের বাজার দখল করেছে প্রাধানত মেয়েদের দ্বারা শিল্প-দ্রব্য উৎপন্ন করিয়ে। আমাদের মেয়েদেরকে দিয়ে কেবল রান্না করিয়ে আমরা ঠকে গেছি। গ্যাস্ ও ইলেট্রিসিটির সাহায্যে ইউরোপে রান্না কর্‌তে অত্যন্ত কম সময় লাগে, তা ছাড়া এরা খায়ও অল্প—তু'তিন রকম তরকারি। বাড়ীর সবাই এক সঙ্গে বসে একই রকম তরকারি খায় বলে পাঁচ জনের জন্যে পাঁচ রকম রাঁধ্‌তে পাঁচবার কয়লা নষ্ট কর্‌তে হয় না, পাঁচবার খাবার জায়গা পরিষ্কার করতে হয় না, পাঁচবার বাসন মাজতে হয় না, পাঁচবার পরিবেশন কর্‌তে হয় না। এমনি করে সময় বাঁচে অনেক। তা ছাড়া মা বাবা ভাই বোন মিলে গল্প কর্‌তে কর্‌তে পরস্পরকে সাহায্য কর্‌তে কর্‌তে খাওয়া কত বড় একটা আনন্দ।

বার্ণ থেকে আসি প্যারিসে। ফ্রান্সে চড়াই উৎরাই যদিও আছে তবু অস্ট্রিয়া বা সুইটজারল্যাণ্ডের মতো নয়। অস্ট্রিয়ার ও রাইনল্যাণ্ডের কত টানেলের ভিতর দিয়ে রেল যায়, সুইজারল্যাণ্ডে কত উপত্যকার ভিতর দিয়ে। ফ্রান্স প্রধানত সমতল বলে রেলের বেগ ভয়ঙ্কর বেশী। ফরাসীরা একটু বেপরোয়াও বটে। প্যারিসের মোটরওয়ালাদের দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই, তারা মোটর হাঁকায় যেন পুষ্পক-বিমান। তবু যে দুর্ঘটনা হয় না এটা ওদের চোখের ও হাতের গুণ। প্যারিসের রাস্তার হাঁটবার সময় প্রাণের মায়া ছাড়তে হয়, রেলে চড়বার সময়ও তাই।

লণ্ডন থেকে প্যারিস্ যেন কল্‌কাতা থেকে মধুপুর। মাঝখানে একটা চ্যানেল (সমুদ্র) থেকে মাটি করেছে। সেটুকু পারাপার করবার সময় বড্ড গা বমি বমি করে। ঐটুকুর ভয়ে বেশীর ভাগ ইংরেজ দ্বীপ থেকে বেরুতে চায় না, কুণো বলে তাদের সবাই ঠাট্টা করে।

ছবির আবহাওয়াটি প্যারিসের বিশেষত্ব। জার্মেনীর যেমন গানের আবহাওয়া। প্যারিসে যেখানে যাই দেখি কেউ না কেউ ছবি আঁকছে—নদীর ধারে কেউ মাছ ধর্‌ছে, কেউ ছবি আঁক্‌ছে, কাফেতে বসে কেউ সরবৎ খাচ্ছে, কেউ ছবি আঁক্‌ছে, এমন কি রাস্তায় ধারেও কেউ লোক চলাচল দেখ্‌ছে আর এঁকে নিচ্ছে। নানা দেশের চিত্রকর দেখি, চীনাম্যানও আছে। প্যারিসে ছবি ও মূর্তির ছড়াছড়ি—যাদুঘর ও চিত্র-প্রদর্শনী বাদ দিলেও মাঠে ঘাটে যত চিত্র ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখি তত কোথাও দেখিনি। অভিনয়-কলাটাও প্যারিসের হাওয়াতে মিশে রয়েছে—পাঁচ বছরের যে কোনো একটি খুকীও এক নিপুণ অভিযাত্রীর মতো চলে ও কথা বলে। আর সেন নদীর ধারে পুরোনো বইয়ের দোকান বড় কম নেই। ফরাসীদের খুব বই পড়ার সখ বলে ফরাসী বইগুলো সস্তাও খুব। ফরাসী খবরের কাগজও অসম্ভব সস্তা, যদিও বিজ্ঞাপন তারা কম ছাপে আমাদের চেয়ে। ফরাসীরা মোটে চার কোটি হয়েও কেন পৃথিবীর একটা শ্রেষ্ঠ জাতি তা' এর থেকে কিছু কিছু অনুমান কর্‌তে পার্‌বে।

লণ্ডন ১৩৩৫

আবার জার্মেনী

আইসেনাখ, জার্মেনী।

তোমাদের জার্মেনীর মানচিত্রে বোধ হয় আইসেনাখ্‌কে খুঁজে বের কর্‌তে পার্‌বে না। তাই বলে দিচ্ছি, এটি ভাইমারের কিছু পশ্চিমে। জার্মেনীর এই অঞ্চলটিকে বলে ঠুরিঙ্গিয়া। যেখানে বসে লিখ্‌ছি সেখান থেকে যত দূর দৃষ্টি যায় কেবল পাহাড় আর ফার্‌ গাছের বন আর উপত্যকা আর বিরল-বসতি গ্রাম। একটি ছোট পাহাড়ের উপরে অতি প্রাচীন ভার্ট্‌বুর্গ্‌ দুর্গ; তার দ্বারদেশে মার্টিন্‌ লুথার তাঁর প্রোটেস্ট্‌ প্রচার করেন; সেই থেকে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ছেড়ে অনেক লোক বেরিয়ে যায়—তাদের নাম হয় প্রোটেস্ট্যাণ্ট্‌। দুই দলে ত্রিশ বছর ধরে যুদ্ধ চলে; শেষে একটা আপোস হয়।

মার্টিন লুথারের ধর্মমত ছিল বড় নীরস—গান বাজনা ছবি ও মূর্তি ইত্যাদির তিনি ছিলেন জাত-শত্রু। ক্যাথলিকরা কতকটা সাকারবাদী; প্রোটেস্ট্যাণ্ট্‌রা ঘোরতর নিরাকারবাদী। ক্রমে ক্রমে প্রোটেস্ট্যাণ্টরাও গান বাজনার অভাব বোধ করে; তখন তাদের মধ্যে এক মস্ত বড় গুণী লোকের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম বাখ্‌। বাখের পরে আরো অনেক সঙ্গীতজ্ঞের আবির্ভাব হয়েছে—যেমন, মোৎসার্ট, বেঠোভেন্‌,

ভাগ্‌নার। কিন্তু অনেকের মতে বাখ্‌ হচ্ছেন সঙ্গীতসাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্‌। মার্টিন্‌ লুথারের মতো বাখ্‌ও এই আইসে-নাখের লোক।

ফ্রান্সের প্রাণ যেমন প্যারিস, ইংলণ্ডের প্রাণ যেমন লণ্ডন, জার্মেনীর প্রাণ তেমন কোনো একটা স্থানে কেন্দ্রীভূত নয়, ছোট-বড় নানা গ্রামে শহরে ছড়ানো। তাই জার্মেনীকে জান্‌তে হলে বার্লিনে কিম্বা ভিয়েনায় বসে থাক্‌লে চলে না। জার্মেনীর প্রায় প্রত্যেক জেলারই স্বতন্ত্র প্রাণ। জেলাগুলি এক কালে স্বাধীন রাজ্য ছিল, তাদের কোনোটার মালিক রাজা-রাজড়া, কোনোটার মালিক ধর্মযাজক, কোনোটার বা সর্বসাধারণ। তাদের আকার আয়তনও অত্যন্ত অসমান। কোনোটা হয়তো মাত্র একটা শহর, কোনোটা বাংলা দেশের চেয়ে বড়।

নিজের দেশের স্বাভাবিক ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্যেই উড়োপাখীর ঝাঁক তীর্থ-যাত্রীর মতো বেরিয়ে পড়ে। Wandervogelদের কথা আমি আগেই লিখেছি—জার্মেনীর প্রত্যেক স্থানে এত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিদেশীর পক্ষেও জার্মেনীতে তীর্থ পরিক্রমা করে আনন্দ আছে। জার্মেনীর সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়। কিছুকাল থেকে জার্মেনীতে বিদ্যাচর্চার চেয়ে অর্থ চর্চা প্রবলতর হয়েছে। জার্মেনীর সর্বত্র এখন কারখানা। কারখানার কাজ শেখবার ইস্কুল কলেজ প্রত্যেক শহরেই আছে, এবং শহর জার্মেনীতে অসংখ্য। গান বাজ্‌নার সখ জার্মান মাত্রেরই দেখছি।

আইসেনাখে আস্‌বার আগে ছিলুম ডার্ম্‌স্টাড্‌টে। ওটা ফ্রাঙ্কফুর্টের কিছু দক্ষিণে। সুন্দর শহর। ওর কাছাকাছি অনেক পাহাড়। পাহাড়ের উপরে দুর্গ। পাহাড়গুলোতে কোনো রকম বুনো জানোয়ার নেই। বনগুলো সাধারণত বীচ্‌গাছের, ফার্‌গাছের বন। কাজেই তোমরা যেমন পার্কে হাওয়া খেতে যাও, জার্মানরা তেমনি পাহাড়ে হাওয়া খেতে যায়। পাহাড়গুলো পনেরো শো ফুটের বেশী উঁচু নয়।

ডার্ম্‌স্টাড্‌ট্‌ কতটুকুই বা শহর! তবু তাতে মিউজিয়াম, অপেরা হাউস ও চিত্রশালা আছে। এই আইসেনাখেও মিউজিয়ম আছে গুটি তিন চার। সভ্যতার নিদর্শন আমাদের নেই কেন?

ডার্ম্‌স্টাড্‌টে আস্‌বার আগে ছিলুম সার্‌ব্রুক্‌নের কাছা-কাছি একটি ছোট গ্রামে। বুস্‌ তার নাম। আগে তার কথা লিখেছি। এবার সেখানে থাক্‌বার সময় সেখানকার একটা পোড়ো বাড়ীতে আগুন লাগে। গ্রামের এক ফায়ার-ব্রিগেড্‌ ছিল বটে, কিন্তু তারা এতই কর্মদক্ষ যে বাড়ীখানা তিন ঘণ্টা ধরে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার আগে তারা জলসেচ কর্‌বার সুবিধে করে উঠ্‌তে পার্‌লে না। সারা গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলেরই ইচ্ছা যে পোড়ো বাড়ীখানা পুড়ে ছাই হয়ে যাক্‌, আমরা দেখি। বাড়ীতে জনপ্রাণী ছিল না, জিনিসও ছিল না কিছু।

বুসে যাবার আগে রাইন নদীর খানিকটা জাহাজে করে বেড়াই। কোব্লেন্স্‌ থেকে মাইন্স। মাইন্স শহরটার বয়স
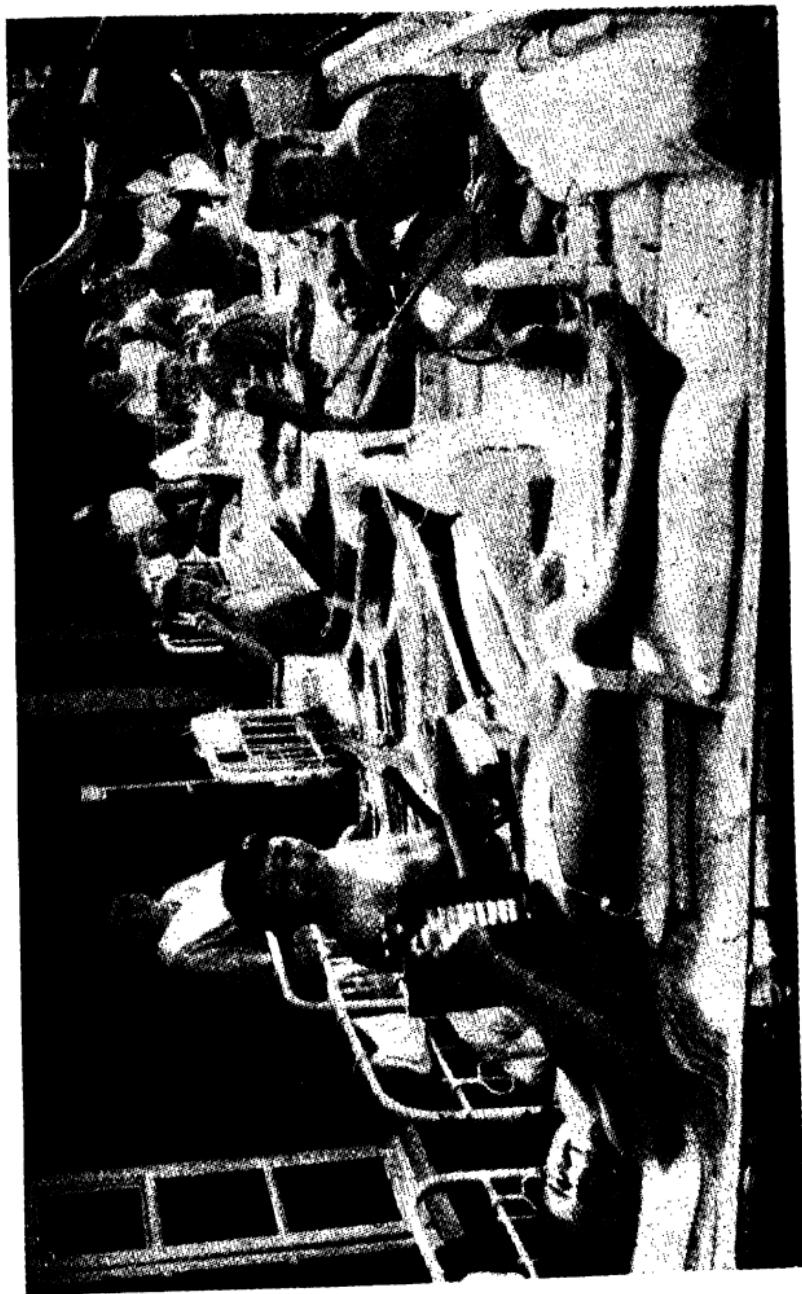
অল্প বয়সী যক্ষা রোগীদের ক্লিনিক

Rembrandt-এর Night watch চিত্র

হাজার দুয়েক বছর। তার মালিক ছিলেন এক ধর্মযাজক। মাইন্সের গির্জা হাজার বছর পুরোণো। মাইন্সের লোক এখনো খুব ধর্মপ্রবণ। গির্জাতে উপাসনার সময় স্থান ধরছিল না। রাস্তায় প্রায় দু'তিন হাজার বালিকা ধর্মপতাকা ধরে শোভাযাত্রায় চলেছিল। তাদের অনেকের হাতে বাদ্যযন্ত্র, অধিকাংশের কণ্ঠে গান।

কোলোনের গল্প আগে লিখেছি। কোলোনে আমি আসি আম্স্টার্ডাম থেকে। আম্স্টার্ডাম শহরটাতে রাস্তা আছে যত কেনাল আছে তত। কেনালগুলো দিয়ে মাল আমদানি রপ্তানি হয়। যাবতীয় ভারি ট্রাফিক্ জলপথগামী। ঐটুকু দেশ হল্যাণ্ড, তবু আম্স্টার্ডাম্ বন্দরে জাহাজের সংখ্যা নেই।

আম্স্টার্ডামের বড় মিউজিয়মটাতে দেদার ছবি আছে। হল্যাণ্ডের লোক ছবি আঁকায় ওস্তাদ। হল্যাণ্ডের বাড়ী-গুলোর গড়নেরও বিশেষত্ব আছে। অনেক বাড়ীর দেয়াল ঘেঁষে কেনাল গেছে। জানালা থেকে পা ঝুলিয়ে দিলে জলে পড়ে। কিন্তু কেনালের জলের গন্ধ তোমাদের নাকে সইবে না।

আটস্টারডামে জাভার লোক প্রায়ই দেখ্তুম। একটা মিউজিয়াম আছে, তাতে জাভা প্রভৃতি হল্যাণ্ড্-শাসিত দেশের শিল্পদ্রব্য সংগৃহীত হয়েছে। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দেখে বোঝা গেল জাভার হিন্দু সভ্যতা আমাদের থেকে খানিকটা ভিন্ন হ'লেও একেবারে ভিন্ন নয়। রামের রং

শাদা, কৃষ্ণকে দেখ্‌তে দাঁতওয়ালা রাক্ষসের মতো, লক্ষ্মী সরস্বতীর ফূর্তিবাজ চেহারা; কেবল গণেশটিকে দেখে একটু গম্ভীর মনে হলো।

হল্যাণ্ডের রাজধানী হেগ্‌ শহরটি সুন্দর আর ছোট। তার ভিতর দিয়েও কেনাল গেছে—কিন্তু আলপনার মতো। হেগ্‌এ সবাই সাইকেল চড়ে—এত সাইকেল আর কোথাও দেখিনি। পুলিশকেও সাইকেল চড়ে পাহারা দিয়ে বেড়াতে আর কোথাও দেখেছ কি?

১৩৩৬

মধ্য জার্মেনী

ভাইমার, জার্মেনী

ভাইমার ছোট্ট একটি শহর। এখানে মহাকবি গ্যয়টে ছিলেন রাজমন্ত্রী। তাঁর বাড়ী ও বাগান-বাড়ী এখানকার বিশিষ্ট সম্পদ্। বাগান-বাড়ীতে তিনি মাঝে মাঝে বিশ্রাম কর্‌তে যেতেন; ছোট বাড়ী; বেশী কিছু সাজ সরঞ্জাম নেই, খান কয়েক মানচিত্র ছাড়া। কিন্তু তাঁর আসল বাড়ীটা সত্যিই একটা মিউজিয়াম হবার উপযুক্ত! তাতে অজস্র ছবি ও মূর্তি, অসংখ্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং অনেক ভাষার অনেক বিষয়ের অনেক গ্রন্থ রয়েছে—সে সব গ্যয়টের নিজের সংগৃহীত, নিজের ব্যবহৃত। গ্যয়টেকে লোকে কেবল কবি ও ঋষি বলেই জানে; কিন্তু তিনি তখনকার কালের পক্ষে একজন উঁচুদরের বৈজ্ঞানিকও ছিলেন! পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, ধাতুবিজ্ঞান (metallurgy) প্রভৃতি অনেকগুলি বিজ্ঞান তাঁর হাতে কলমে জানা ছিল এবং চোখের সঙ্গে রঙের যোগাযোগ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব একটা থিওরী চলিত আছে। তাঁর ল্যাবরেটরী দেখে তাঁর বহুমুখ কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া যায়, কত রকম প্রজাপতি ও শামুক তিনি সযত্নে সাজিয়ে রেখেছিলেন, এখনো রয়েছে।

মহাকবি শিলারও ছিলেন এই ভাইমার শহরে। একটি

ছোট্ট শহরে হু'জন মহাকবির সমাবেশ যেন এক সঙ্গে সূর্য চন্দ্রের উদয়।

বার্লিন্ থেকে লাইপ্ৎসিগ্, জার্মেনী

পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম শহর বার্লিন আমার পছন্দ হয়নি। কেম হয়নি কারণ বলা শক্ত। তোমরা হয়তো চেপে ধর্বে, বল্বে—বাঃ রে, এমন সব চওড়া চওড়া রাস্তা, আলো বাতাসের জন্যে এত প্রচুর ফাঁক, এমন সব মজ্‌বুৎ অট্টালিকা, ভূমিকম্প হয়ে গেলেও টল্‌বার নয়, এমন সব জবরদস্ত মানুষ, কাবুলীওয়ালার মতো চেহারা; তবু তোমার পছন্দ হলো না? আমি এর জবাবে বল্‌বো—সব ঠিক্, তবু শহরটা যেন কলের মতো চল্‌ছে, যেন প্রাণী নয়, যন্ত্র। অগুনতি কল্‌কারখানা তার দিকে দিকে, রাস্তায় রাস্তায় লরী ঘুর্‌ছে, মানুষগুলো যত পারে কলকে খাটিয়ে নিচ্ছে। পোস্টাফিসের চিঠি চালাচালি হয় এক নলের ভিতর দিয়ে। বড় বড় রাস্তাগুলোতে গাড়ী থামবার জন্যে পুলিশ নেই, লাল-সবুজ-হলদে সিগ্‌নল্ দেখে গাড়ীগুলো আপনি থামে, চলে মন্থর হয়ে। কোনো কোনো থিয়েটারের স্টেজ্ ঘূর্ণ্যমান —অর্থাৎ একটা দৃশ্য শেষ হয়ে গেলে সীন্ ফেলতে হয় না, সীন্ তুলতে হয় না, সমস্ত স্টেজ্‌টাই পাশ ফিরে দাঁড়ায়, তখন দেখা যায় যেখানে একটা চায়ের আড্ডা ছিল সেখানে একটা বৈঠকখানা। অভিনয় শুরু হবার আগে থেকেই গোটা কয়েক দৃশ্য স্টেজের এ পিঠে ও পিঠে সাজানো থাকে,

অভিনয় হবার সময়ও উল্টো পিঠটাতে সাজানো চল্‌তে থাকে।

বার্লিন হচ্ছে এরোপ্লেনের প্রধান আড্ডা। প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায় শঙ্খচিলের মতো এরোপ্লেন উড়ছে। এরোপ্লেনের আওয়াজ জেপলিনের আওয়াজের কাছে লাগে না। এরোপ্লেনের চেহারাও জেপলিনের মতো হাস্যকর নয়। জেপলিনটা একটা অতিকায় মাছের মতো দেখতে। অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে হেলে দুলে ধীরে সুস্থে সাঁতার দেয়।

জার্মেনীর প্রত্যেক জায়গায়—বিশেষ করে বার্লিনে—অসংখ্য নাপিতের দোকান। যে কোনো রাস্তায় পা দিলেই দেখা যায়—"নাপিত" "নাপিত" "নাপিত"……(friseur)। গ্রীষ্মকালটা প্রায় প্রত্যেক জার্মান পুরুষই মাথা মুড়োয়। আমার মাথায় চুল দেখে আমার বন্ধুরা ধরে বসেছিল—"মাথা মুড়োতে হবে। কেবল সাম্‌নের দিকে কাকাতুয়ার মতো ঝুঁটি রাখ্‌লেই চল্‌বে।" তোমরা জার্মেনীতে এলে কাকাতুয়া সেজো। জার্মান মেয়েরা অন্যান্য ইউরোপীয় মেয়েদের মতো প্রায়ই চুল ছাঁটায়, কিবা শীত কিবা গ্রীষ্ম। তাই এত নাপিত।

বার্লিনের চিড়িয়াখানাটা দেখ্‌বার মতো। পশুপাখী যেমন সব দেশের চিড়িয়াখানায় তেমনি বার্লিনেও। কিন্তু পশুপাখীর থাকবার জন্যে এমন সুন্দর পাহাড়, গুহা, মন্দির, প্যাগোডা ইত্যাদি কোথাও নেই। হাতীরা যেখানে থাকে

সেটা একটা ভারতবর্ষীয় মন্দিরসমষ্টি। উটপাখী যেখানে থাকে সেটা প্রাচীন ঈজিপ্টের ধরণে তৈরি ও তার গায়ে প্রাচীন ঈজিপ্টের নক্সা। রেড্ ইণ্ডিয়ান ও চীনে ধরণের পশুপক্ষীশালাও আছে। জীবজন্তুর পাথরের গড়া মূর্তিও স্থানে স্থানে স্থাপিত।

নেলোর থেকে সংগৃহীত ভারতবর্ষীয় গাই বাছুর ও ষাঁড় দেখে দেশের কত কথাই না মনে পড়ল! বার্লিনে ওরা অন্যান্য জন্তুদের সঙ্গে জন্তু; লোকে ওদের পাঁউরুটি চকোলেট্ ছুঁড়ে খাওয়াচ্ছে। আমাদের দেশে ওরা দেবতার মতো সেবা ও ভক্তি পায়, মায়ের মতো ভাইয়ের মতো মমতা পায়। এখানে কেউ ওদের ঘাস খাইয়ে সুখ পায় না, সুখ দেয় না। দেশের জন্যে বেচারীদের মন কেমন কর্ছে! খোলা মাঠের, জন্যে রাখালের গোষ্ঠের জন্যে!

জাগুয়ারেরা পরস্পরের লেজ টানাটানি করে বেশ সুখে আছে। সিংহরা পড়ে পড়ে ঘুমোয়। ওদের বাচ্চাদেরকে একটা কুকুর মাই দেয় এবং ছোট ছেলেমেয়েরা কোলে নিয়ে ফোটো তোলায়। সিংহের বাচ্চারা খুব নিরীহ ও হাসি-খুশি! সুন্দর বনের বাঘটা বাংলাদেশ ছেড়ে এসে বড্ড একলা বোধ কর্ছে, নিশ্চয়ই তোমাদের কথা ভেবে ওর কান্না পাচ্ছে। চিড়িয়াখানাতে থাক্তেই সেদিন আমাদের দেশের হাতী-হাতিনীর এক বাচ্চা হয়েছে, ভারি চপল।

গ্যয়টে (Goethe)

Raphael-এর Sistine Madonna চিত্র

ড্রেস্‌ডেন

লাইপৎসীগ্‌ বার্লিনের মতো শিল্পবহুল হলেও বার্লিনের চেয়ে ফাঁকা। নতুন টাউন হল্‌, নতুন থিয়েটার, নতুন রেলস্টেশন ইত্যাদি লাইপৎসীগের বাস্তু সম্পদ। গান বাজ্‌নার জন্যে লাইপৎসীগের জগদ্‌ব্যাপী সুখ্যাতি। প্রায় প্রত্যেক কাফে রেস্তরাঁতে সঙ্গীতের আয়োজন।

ড্রেস্‌ডেন লাইপৎসীগের চাইতেই বার্লিনের চাইতে দেখ্‌তে সুন্দর, কিন্তু যত সুন্দর ভেবেছিলুম তত সুন্দর নয়, বড় আড়ম্বর সম্পন্ন। গির্জাগুলোর ভিতরে ও বাইরে রকমারি নক্সা—প্রাসাদগুলোর তো কথাই নেই। লক্ষ্ণৌয়ের সঙ্গে তুলনা কর্‌তে ইচ্ছে হয়। ড্রেস্‌ডেনের রাজারা সিংহাসন ছেড়ে চলে গেছে—প্রজারা নিজেরাই নিজেদের চালক। রাজাদের সঞ্চিত মণিমাণিক্য এখন সবাইকে দেখানো হয়—হীরা, নীলা, হাতীর দাঁত ও mother-o-pearl-এর কাজ। আমাদের মোগল বাদ্‌শাদের দরবারের একটা ছোট আকারের মডেল দেখ্‌লুম। সিংহাসনে সম্রাট বসেছেন, তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম কর্‌ছে কারা সব, হাতীতে চড়ে কারা সব এসেছেন, প্রহরী সভাসদ্‌ ও ভৃত্যগণ নিজের নিজের স্থানে দণ্ডায়মান। সোনারূপার কাজ। একখানা হীরা সম্রাটের পায়ের কাছে।

ড্রেস্‌ডেনের চিত্রশালার দেশ-বিদেশে নাম আছে। তার সম্পদ্‌ Raphaelএর শ্রেষ্ঠ কীর্তি Sistine Madonna; তাই দেখতেই ড্রেসডেনে কত লোক আসে।

ড্রেসডেনের চিড়িয়াখানার প্রধান সম্পদটিকে তোমাদের দেখতে ভারি ইচ্ছা করবে। "Charlie" কেবল যে সাইকেল চালায় তাই নয়, স্কেট করে, স্লেজে চড়ে, দড়ির ওপর হাঁটে, বলের ওপর দাঁড়িয়ে বল্‌টাকে গড়াতে গড়াতে নিয়ে যায়, টেবিলে খায় ও তার মাস্টারকে খাওয়ায়। চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ Charlieকে দিয়ে বেশ রোজগার করিয়ে নেন; কেননা তাকে দেখতে আলাদা করে পয়সা দিয়ে অনেক লোক আসে ও হাসে। সেটি একটি শিম্পাঞ্জি।

১৩৩৬

চেকোস্লোভাকিয়া

চেকোস্লোভাকিয়া নামটি নতুন বলে দেশটি নতুন নয়। সেকালে যাকে বোহিমিয়া বলা হতো তারই সঙ্গে হাঙ্গেরীর উত্তরাংশ যোগ করে দুইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে চেকো-স্লোভাকিয়া অর্থাৎ চেক্ ও স্লোভাকদের দেশ।

প্রাহা বা প্রাগ্ এই দেশের রাজধানী। শহরটির বয়স পনেরো শো বছরের কিছু বেশী। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের দ্বিতীয় পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়। Vltava নদীর দুধারে শহর, নদীটি বেশ বড় ও কতকটা আঁকাবাঁকা, শহরের একদিকে পাহাড়। শহরটি উঁচুনিচু।

বৃহৎ শহর। সম্প্রতি লোকসংখ্যা বাড়তে বাড়তে দশ লাখের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। লোকের ভিড়ে পথ চলা দায়। পাথর বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দিনরাত ঘোড়ায় টানা গাড়ী চলেছে—তার শব্দে রাত্রে ঘুম হয় না। চেকো-স্লোভাকিয়া আগে ছিল চাষাদের দেশ। এখন দিন দিন তার যন্ত্রশিল্পের উন্নতি হচ্ছে। তাই প্রাহার আয়তন দ্রুতগতিতে বাড়্তেই লেগেছে। Vltava নদী Elbe নদীতে পড়েছে—Elbe নদী সমুদ্রে। বন্দর হিসাবে প্রাহা মন্দ নয়। এরোপ্লেনের চলাচল খুব বেশী।

প্রাহার প্রাচীন নগরগৃহের গায়ে একটি ঘড়ি আছে। বারোটা বাজলে বারোজন apostle ঘড়ির নিচে দুটি

জানালা খুলে সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে দর্শন দেন। হ্রাদচানী পাহাড়ের উপরে এক প্রসিদ্ধ গির্জা আছে—তাতে এই সময়টায় একটা উৎসব চলেছে ; দেশের সব গ্রাম থেকে লোক আসে। তাই দেখতে গিয়ে দেখি ভীষণ ভিড়। পুরীর মন্দিরের মতো। চেক্‌রা ধর্মপ্রাণ জাতি। এক প্রাহা শহরেই নাকি একশোটা গির্জা আছে। দেখি সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে ; সারি বেঁধে লোক দাঁড়িয়ে গেছে ; খোলা দরজা দিয়ে একটি একটি করে লোক ঢুক্‌ছে। আমাদের চেক্ বন্ধুনী পুলিশকে বললেন, "ইনি ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন। কাল চলে যাবেন। এঁর প্রবেশের সুবিধা করে দিন্।" তখন পুলিশ একজন সরকারী কেরানীকে ওকথা বললে। সে ভদ্রলোক বললেন, "আপনারা আমার পিছু পিছু আসুন, এখানে আপনাদের টিকিট দিলে লোকে ভাববে পক্ষপাত দেখাচ্ছি।" তাঁর সঙ্গে গিয়ে লুকিয়ে টিকিট কেনা গেল—তারপরে আমরা জনতার সারির ভিতরে এক জায়গায় একটু ফাঁক দেখে দাঁড়িয়ে গেলুম। ওটা অবশ্য অন্যায়, কেননা আগে থেকে যারা টিকিট কিনেছিল তাদের অনেকে রইল আমাদের পিছনে। একটু একটু করে এগিয়ে দরজার অনেকটা কাছে এসেছি এমন সময় দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা শ' তিন চার লোক বাদ পড়ে গেলুম। সবাই মিলে বিষম প্রতিবাদ কর্‌তে লাগ্‌লো। বললে, আমরা তিনঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি, সাতদিন আগে থেকে টিকিট কিনেছি, দাঙ্গা বাধে আর কি ? পুলিশরা বললে, "আমরা কী

কর্‌বো ? হুকুম দিয়েছেন উপরওয়ালারা।" তখন জনতা বললে, "ডাকো উপরওয়ালাদের। ওরা কেমন উপরওয়ালা একবার দেখে নিই।" বেশীক্ষণ ওদের দলে না দাঁড়িয়ে আমরা গির্জার অন্য একটা দরজার অভিমুখে চললুম। সেটিতে ঢুক্‌তে গিয়ে শুনি সেটা কেবল বড় বড় আমীর ওম্‌রাহদের জন্যে। তখন কী করি ? গির্জার একটা অংশে বিনা টিকিটে ঢুক্‌তে দেয়। সেই অংশটা দেখলুম। যেখানটায় সেকালের রাজাদের রত্নময় মুকুট-দণ্ড ইত্যাদি রক্ষিত ছিল সেখানটা কেবল আমীর ওম্‌রাহরাই দেখতে লাগলো, বাইরে থাক্‌লো প্রত্যাখ্যাত জনতা।

ঐ গির্জার অভ্যন্তরে সাধুদের মূর্তি আছে। প্রাহা নগরী এক কালে সাধুসন্তদের পীঠস্থান ছিল। প্রাহার সেকালের একজন পুণ্যবান রাজা খ্রীস্টীয় জগতের সর্বত্র প্রখ্যাত।

প্রাহাতে ইহুদীদের উপরে অত্যন্ত অত্যাচার করা হতো। তাদের Ghettoর (ইহুদীপাড়ার) চারিদিকে পাহারা ছিল, অনুমতি না নিয়ে তারা পাড়ার বাইরে যেতে পার্‌তো না এবং সন্ধ্যা হলেই ফিরে আস্‌তে বাধ্য হতো। তারা বংশানুক্রমে সেই পাড়াটিতেই জন্মাতো এবং মর্‌তো—এক একটা ছোট ছোট ঘরে এক একটা একান্নবর্তী পরিবার গোরু-শূওরের মতো থাক্‌তো। তাদের গোরস্থানটাতে পনেরোশো বছর ধরে সত্তর হাজার শবদেহ প্রোথিত হয়েছে, একটির উপরে একটি, একটির গায়ে আরেকটি।—শেষে বাদ্‌শাহ

দ্বিতীয় জোসেফ্‌ ইহুদীদের কতকটা স্বাধীনতা দেন। এবং পরে ক্রমে ক্রমে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায়।

কত অত্যাচার সহ্য করে ইহুদীরা জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিদের অন্যতম হয়েছে। যত প্রসিদ্ধ লোকের নাম তোমরা শোন একটু খোঁজ নিলে জান্‌বে তাদের অনেকেই ইহুদী। আমেরিকার ফিল্‌ম্‌-স্টারদের অনেকেই যে ইহুদী শুনে হয়তো অবিশ্বাস করবে। দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবসাদার ও ফিল্‌ম্‌স্টার সব কাজেই ওরা হাত লাগায়।

প্রাহাতেও জার্মেনীর মতো সঙ্গীতের খুব আদর। জার্মানদের সঙ্গে চেক্‌দের বনিবনা নেই, কিন্তু জার্মান সঙ্গীতকে ওরা ছেড়ে থাক্‌তে পারে না। অত্যন্ত বাদবিসম্বাদকে সঙ্গীতচর্চার ঐক্য কতক পরিমাণে লাঘব করেছে। আমার যে বন্ধুনীটির উল্লেখ করছি তাঁর ছেলের বয়স সবে ষোলো বছর, সে জার্মান ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজী এই তিনটে বিদেশী ভাষা এক রকম শিখে নিয়েছে, সঙ্গীতে সে তার মায়ের শিক্ষা পেয়ে ইতিমধ্যেই ওস্তাদ হয়ে উঠেছে! বেহালায় তার পাকা হাত। মহিলাটি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খবর রাখেন, তাই তাঁর ছেলে ভারতবর্ষে গিয়ে যোগীদের শিষ্য হতে চায়। সেদিন উপনিষৎ পড়ছিল। প্রাহাতে রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার বক্তৃতা দিয়েছেন—শুন্‌লুম তাঁকে দেখ্‌বার জন্যে লোকারণ্য হয়েছিল।

চেক্‌দের মাথার চুল কালো। রং খুব ফর্‌সা নয়! রান্নাও

তাদের কতকটা আমাদের রান্নার সঙ্গে মেলে। দই আমি ইংলণ্ডে ফ্রান্সে জার্মেনীতে কত রকম খেয়েছি, কিন্তু দেশের দই খেলুম প্রাহাতেই প্রথম। এক রকম মাছও খেলুম, নদীর মাছ—সেও আমাকে এই প্রথম দেশের মাছের স্বাদ মনে করিয়ে দিল। চেক্‌দের পোশাক এখন সাধারণ ইউরোপীয় পোশাক। কিন্তু স্লোভাকরা এখনো গ্রাম্য বলে তাদের পোশাক অভিনব। চেক ও স্লোভাক উভয়েই স্লাভ্ বংশীয়।

ড্রেস্‌ডেন থেকে প্রাহা যাই এল্‌ব নদীর ধার ধরে। ঐ অঞ্চলটি বড় সুন্দর। নদীর পাড় উঁচু হয়ে পাহাড় হয়ে গেছে—খাড়া পাহাড়, ভাঙা দুর্গের দেয়ালের মতো দেখ্‌তে। প্রাহা থেকে নুর্‌ন্‌বার্গ চলেছি। প্রাহা থেকে বেরিয়েই একটা সুড়ং পড়লো (—তোমাদের এই কথা লিখ্‌তে লিখ্‌তে আরো এক সুড়ং!)—সুড়ংটা ভয়ানক লম্বা। মিনিট পাঁচেক অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আলোকে চললুম। এ অঞ্চলটাও বিলক্ষণ পার্বত্য।

এইবার তোমাদের কিছু চেক ভাষা শিখিয়ে দিই। চেকরা প্রাগ্‌কে বলে প্রাহা; কার্লস্‌বাডকে বলে কার্লোভী ভারী, বোডেন বাখ্‌কে বলে পোড্‌মোকলী। জার্মান ভাষার সঙ্গে চেক ভাষার এতই তফাৎ। যতগুলো চেক কথা শিখেছিলুম ভুলে গেছি—কেবল মনে আছে যে চেক ভাষায় স্বরবর্ণ বাদ দিয়ে বা অল্প মিশিয়ে ব্যঞ্জনবর্ণের শব্দই অনেক। "তোমার আঙুলটা তোমার গলার ভিতরে

ঢোকাও”—এর চেক ভাষান্তর হলো, “strc prst skrs krk.” মুর্‌গীকে ওরা বলে Slepicka (স্লপিচ্‌কা)।

১৩৩৬

[উপরে যে উৎসবের নাম করেছি সেটা পুণ্যবান রাজা Wenceslasএর সহস্রতম সাম্বৎসরিক। গির্জাটার নির্মাণ বহু শতাব্দীর পরে সেদিন সমাপ্ত হয়েছে।

ইংরেজীতে একটি Christmas Carol (আমাদের যেমন আগমনী গান) আছে সেটি চেকদের পুণ্যবান রাজা Wenceslasকে নিয়ে। “Good King Wenceslas looked out on the Feast of Stephen”. রাজা একটি দরিদ্রকে অন্ন দেবার জন্যে শীত কুয়াশা বরফ তুচ্ছ করে তার কুটীর অবধি হেঁটে যান। Carolটি ইংরেজ ছেলেমেয়েদের ভারি প্রিয়।]

শেষ জার্মেনী

ন্যুর্‌বার্গ্‌ দেখে তৃপ্তি হলো। সম্প্রতি যতগুলি শহর দেখছি ন্যুর্‌বার্গ্‌ই সব চেয়ে সুন্দর। পুরোনো শহরকে ঘিরে একটা নতুন শহর গড়ে উঠেছে—পুরোনো শহরটারও পরিবর্তন হয়েছে অনেক। তবু মোটের উপর পুরোনো শহরটি পুরোনোই রয়েছে। তার চারদিকে প্রাচীর ও প্রাচীর-তোরণ ও প্রাচীর-গম্বুজ। প্রাচীরের ওপারে পরিখা। পুরোনো শহরটি উঁচু নিচু—একটা দিক তো রীতিমতো পাহাড়ে। রাস্তাগুলোর একটার থেকে আরেকটায় যেতে হলে অনেক সময় সিঁড়ি বেয়ে যেতে হয়। খুব সরু সরু রাস্তা, অনেক সময় কোণাকুণি। নদী একটি শহরের মাঝখানে এঁকেবেঁকে গেছে। নালার মতো ছোট ও অগভীর। নদীর পুল অনেক। নদীর ধারে ধারে বাঁধের মতো দাঁড়িয়েছে। সেকেলে ছাঁদের বাড়ী।

ন্যুর্‌বার্গে জার্মেনীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ডুরার (Durer) বাস করতেন। ডুরারের বাড়ী এখনো তেমনি আছে—যদিও তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ। ডুরারের খান কয়েক ছবির অরিজিন্যাল এখনো ঐ বাড়ীতে আছে।

জার্মান সঙ্গীতকার ভাগ্‌নার "মাস্টার সিঙ্গার্‌স্" বলে একখানা অপেরা রচনা করেন। ঐ অপেরার ঘটনাস্থল ন্যুর্‌বার্গের মুচিরা সেকালে একটা কবিওয়ালার দল করেছিল।

দলের নাম "মাস্টার সিঙ্গার্‌স্‌" বা "ওস্তাদ গাইয়ে"! মুচিরা সত্যি সত্যিই গানের ওস্তাদ্‌ ছিল বলে তাদের গান শুনতে দেশ বিদেশের লোক আস্‌তো। একবার তাদের এক কবির লড়াই হয়। সেই লড়াইয়ের দ্বারা স্থির হয় দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কে একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে কর্‌বে। যিনি বিচার করে স্থির করেন সেই মুচিটির নাম হান্‌স্‌ সাখ্‌স্‌ (Hans Sachs)। তাঁর বাড়ী এখনো আছে।

নুর্ন্‌বার্গের কয়েকটা গির্জা বাইরে থেকে তথা ভিতর থেকে দেখ্‌তে সুন্দর। একটা গির্জার নাম Frauen Kirche বা জননী মেরীর গির্জা। আরেকটার নাম Lorenz Kirche বা সেণ্ট্‌ লরেন্সের গির্জা।

জার্মান ন্যাশ্‌নাল মিউজিয়াম নুর্ন্‌বার্গের গৌরব। মিউজিয়ামের নিচের তলাটা বোধ হয় এককালে একটা মঠ ছিল। গথিক ছাঁদের সীলিং ও খিলান। অনেক খ্রীষ্টীয় মূর্তির ভিড়। উপরের তলায় ডুরার প্রভৃতি চিত্রকরের চিত্রপট। পাশের ঘরগুলিতে সেকেলে পোশাক, সেকেলে আস্‌বাব, সেকেলে বাসন, সেকেলে কলকব্জা, সেকেলে পুঁথি। গোলোক ধাঁধার মতো বৃহৎ ব্যাপার—একবার ঢুক্‌লে বেরুবার পথ পাওয়া কঠিন! মিউজিয়ামের বাড়ীটার ছাতের গড়নের বিশিষ্টতা আছে।

নুর্ন্‌বার্গ থেকে আসি Wurzburg, শুধু রাতের বেলাটা সেখানে শুয়ে কাটাতে। Wurzburgএর গল্প আগে লিখেছি। Wurzburg থেকে চলেছি

Frankfurt হয়ে রাইন নদীর ধারে কোলোন্ ও কোলোন্ থেকে আখ্ন (Aachen) হয়ে ব্রাসেল্স্। হয়তো আজ আখ্নে রাত কাটাতে পারি। ট্রেনে ঘুম হয় না, নইলে এতবার এখানে ওখানে নেমে হোটেল খুঁজে সময় ও অর্থ নষ্ট কর্‌তে হতো না। ট্রেনেতেই খাবার গাড়ী আছে—কোনোটা Mitropa কোম্পানীর, কোনোটা Wagon Lits কোম্পানীর। এদের খাবার গাড়ী কন্টিনেণ্টের প্রায় সব দেশেই এক্স্‌প্রেস্ ট্রেনের সঙ্গে থাকে। ইংলণ্ডের খাবার গাড়ীগুলো রেল্ কোম্পানীদের নিজেদের সম্পত্তি, যেমন আমাদের দেশেও।

এই মাত্র Wiesbadenএ আমাদের ট্রেন থেমেছে।

প্ল্যাট্‌ফর্মের উপর দাঁড়িয়ে বিশ পঁচিশ জন লোক বিয়ার টান্‌ছে আর গান জুড়ে দিয়েছে। গানটা বোধ হয় তাদের জাতীয় সঙ্গীত কিম্বা তেমনি কিছু যা সবাই এক সঙ্গে গাইতে জানে। বিয়ার ও গান—এ দুটো জার্মান মাত্রেই টানে ও জানে। যেখানে যাও সেখানেই বিয়ার পান ও বাদ্যগান।

ব্রাসেল্স্ থেকে লণ্ডন

জার্মেনী থেকে বেল্‌জিয়ামে ঢুকতেই দেখি ঘন সবুজ ঘাসে মোড়া অত্যন্ত অসমতল ভূমি। রেলপথ গেছে এতগুলো ছোট বড় সুড়ং দিয়ে যে মাটি আর আকাশ এই দেখা যায় তো এই দেখা যায় না।

ক্রমে ক্রমে দেখা গেল কল কারখানায় ভরা অপেক্ষাকৃত সমতল অঞ্চল। তারপরে ব্রাসেল্‌স্‌। অন্ধকার রাত্রে আলোক সজ্জিত ব্রাসেল্‌সে যেন দেয়ালীর উৎসব চল্‌ছিল। শনিবারের রাত। অসংখ্য কাফেতে অগুন্‌তি লোক বসে বিয়ার খাচ্ছে। জার্মেনীতে কাফে আছে বটে, কিন্তু এত নয়। বেল্‌জিয়াম মনে প্রাণে ফরাসী। তবে বেল্‌জিয়ামের অর্ধেক লোক ফ্লেমিশ। ওরা জার্মান ও ওলন্দাজদের সগোত্র। দেখা গেল ব্রাসেল্‌সের সব জায়গায় দুটো ভাষায় বিধি-নিষেধ ও পথঘাটের নাম লেখা রয়েছে। একটা তো ফরাসী, আরেকটা জার্মান ভাষার অপভ্রংশ এবং ওলন্দাজ ভাষার মতো। যথা, Bruxelles ও Brussel; Rue ও Straat. ব্রাসেল্‌সের প্রায় সকলেই ইংরেজী জানে।

আজ রবিবার। সকালে উঠে দেখি সৈন্যেরা শোভা-যাত্রায় বেরিয়েছে—সবটা রাস্তা জুড়ে। ভারি হৈ চৈ—মিলিটারি বাজনা। ব্রাসেল্‌সের প্রসিদ্ধ ক্যাথিড্রলে গিয়ে দেখি অর্চনা চলেছে, ভক্তরা নম্র হয়ে যোগ দিচ্ছেন। অনেক কালের গির্জা। ভিতরের মূর্তিগুলোকে নির্জীব ও নূতন মনে হলো বাইরের মূর্তিগুলোর তুলনায়।

ব্রাসেল্‌সের টাউন হল্‌ও প্রাচীন ও মূর্তিবহুল। বোধ হয় ব্রাসল্‌েসে সবচেয়ে উঁচু তার চূড়া!

হাতে সময় ছিল না বলে কোনো মতে নমো নমো করে ঐ দুটো দর্শনীয় দেখলুম। ট্রেনের যে গাড়ীটাতে

উঠি সেটাতে জনকয়েক লোক দুটো বড় বড় খাঁচায় দু'রকম দু'ঝাঁক পাখী নিয়ে উঠ্‌ল। বোধ হয় বিক্রী কর্‌তে নিয়ে গেল। ওরা নাম্‌ল ইংরাজীতে যাকে বলা যায় Ghent সেইখানে। ফরাসী নাম Gand (গাঁ)। ফ্লেমিশ্‌ নাম Gent.

১৩৩৬

ইটালী

ইউরোপ ছেড়ে এসেছি, ভারতবর্ষে ভিড়িনি, অবস্থাটা ত্রিশঙ্কুর মতো। এখন এটা লোহিত সাগর। তোমরা ভাবছো, সমুদ্রের জল নিশ্চয়ই লাল। আমি দেখছি, ঘন নীল। সব সমুদ্রের রং এক—তবু নাম তো দিতে হবে একটা।

মার্সেল্‌সে জাহাজ ধর্‌বার আগে আমি কিছু দিন ইটালীটা ঘুরে আসি। লণ্ডন থেকে উত্তর ফ্রান্স ও সুইটজারল্যাণ্ডের বার্ণ্‌ ও ইটালীর ডোমোডসোলা কেবল সুড়ং আর সুড়ং। কিন্তু ভারি সুন্দর। ইটালীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়টা হলো সৌন্দর্যের সূত্রে। উত্তর ইটালীর হ্রদগুলি কী সুন্দর! হ্রদের মাঝখানে দ্বীপ; দ্বীপে যাদের বাড়ী তারা কী ভাগ্যবান!

মিলান ইটালীর সবচেয়ে বড় শহর, কল কারখানায় ভরা। তবু তার থেকে আল্পস্‌ পাহাড় দেখা যায় ও তার চারিদিকে বন। মিলানের বড় গির্জা (Cathedral) যেমন বৃহৎ তেমনি বিচিত্র। মিলানের একটি পুরাতন মঠে প্রসিদ্ধ চিত্রকর লেওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা যীশু খ্রীস্টের "শেষ ভোজন" নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীর চিত্র আছে। ছবিখানার নকল তো আমরা কত দেখেছি, তোমরাও দেখেছ, কিন্তু আসলটির তুলনা হয় না! সামান্য একটা দেয়াল,

তার দিকে তাকালে মনে হয় সত্যিকার একটা ঘরে জলজ্যান্ত মানুষ। সমতলকে অসমতলের মতো করে দেখানো লেওনার্দো ও মিকেলাঞ্জেলোর বিশেষত্ব। ছবি দেখে মনে হয়, ছবি নয়, মূর্তি, চিত্র নয় ভাস্কর্য।

ভেরোনা শহরটি ছোট হলেও খুব পুরোনো। ইটালীর প্রায় সব শহরই অতি প্রাচীন। ভেরোনায় রোমান আমলের amphitheatre (সার্কাস্-ঘর) আছে! সরু সরু গলি দেখলে কাশী মনে পড়ে। ভেরোনায় বড় গির্জায় খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পাথরে খোদাই করা মূর্তি দেখলুম। তাকে বলে Byzantine যুগের শিল্প।

ভেনিস্ শহরের বর্ণনা তোমরা কত পড়েছ। শহরটার আর প্রাণ নেই, তার প্রাণ ছিল তার অধুনা লুপ্ত বাণিজ্য। বিদেশীরা যায় গঁদোলায় চড়ে তার ধ্বংসাবশেষ দেখতে। "দুয়ার খোলা পড়ে আছে কোথায় গেল দ্বারী।" ঘুমন্তপুরীর মতো নিঃশব্দ তার অট্টালিকাগুলো। তার জলময় পথগুলো ছলাৎ ছল্ করছে।

রোম ইটালীর রাজধানী হয়ে অবধি আবার জেগে উঠেছে। আগে ছিল পোপের রাজধানী, তার আগে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী। ইটালী আর রোমান সাম্রাজ্য এক নয়, পোপের রাজ্য তো একেবারে আলাদা জিনিস। পোপ হচ্ছেন দুনিয়ায় যেখানে যত ক্যাথলিক আছে সকলের "বাবা"। পোপ-কথাটার অর্থই হচ্ছে, বাবা। বাবাজী এখন রোমের মালিক নন্, রোমের এক কোণে তাঁর মঠ-

বাড়ীতে তিনি মনের দুঃখে থাকেন। তাঁর মঠ বাড়ীর নাম ভাটিকান। তার অনেকগুলো ঘরে বড় বড় শিল্পীদের আঁকা অনেক প্রসিদ্ধ চিত্র আছে। মিকেলাঞ্জেলো একটা ঘরের সীলিংকে এমন চেহারা দেন যে মনে হয় একটা অর্ধ চন্দ্রাকার খিলান। রাফেলের আঁকা প্রাচীর-চিত্র তাঁর পঁচিশ বছর বয়সের অমর কীর্তি।

ভাটিকানের কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গির্জা "সেণ্ট পিটার"। সব হিন্দুর যেমন কাশী বিশ্বনাথ, সব ক্যাথলিকের তেমনি সেণ্ট পিটার। মরার আগে একবার দেখা চাই। রোমে আরো তিনটে বড় বড় গির্জা আছে—সেণ্ট জন্, সেণ্ট মেরী, সেণ্ট পল্। একটা ছোট অথচ সুন্দরতর গির্জাতে আছে মিকেলাঞ্জেলার মোজেস্-মূর্তি। ক্রুদ্ধ মোজেস্ দাড়ি ছিঁড়ছেন—তাঁর চোখ জ্বল্ছে, দেহের মাংসপেশীগুলো ফুলে উঠছে ও প্রত্যেকটি শিরা দেখা যাচ্ছে! মর্মর পাথরে এমন করে জীবন্যাস কর্তে ক'জন পেরেছে?

রোমান্দের রোমের ধ্বংসাবশেষ তাদের কলোসিয়াম, সেটাও একটা সার্কাস্-ঘর, সেখানে রোমান রাজারা খ্রীস্টানদেরকে সিংহের সঙ্গে লড়াই কর্তে ছেড়ে দিতো। আন্দ্রোক্লিস্ ও সিংহের গল্প তো তোমরা জানো। রোমানদের চণ্ডীমণ্ডপ, অর্থাৎ যেখানে তারা আড্ডা দিতো, সেখানটাকে বলে ফোরাম। সেখানে কয়েকটা ভাঙা স্তম্ভ আছে—সুদীর্ঘ, সতেজ, গম্ভীর। শনি মন্দিরের কয়েকটা স্তম্ভ এখনো খাড়া রয়েছে।

রোম—সেন্ট পিটার

রোম—ফোরাম্
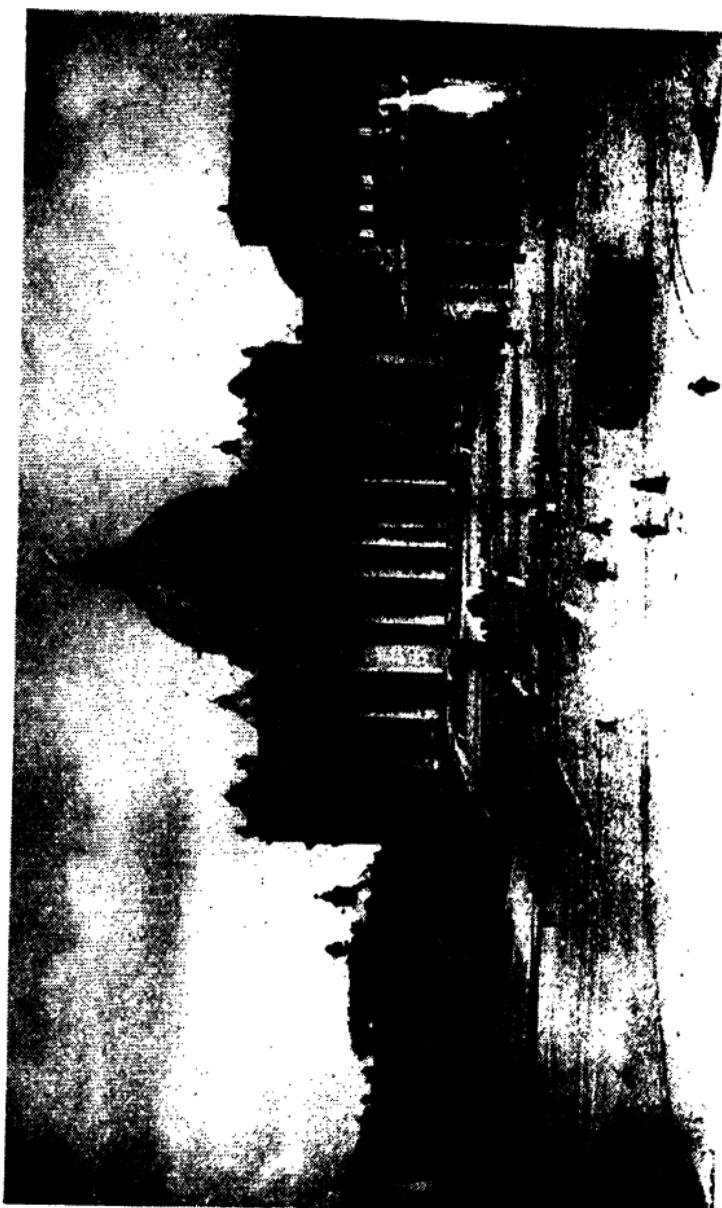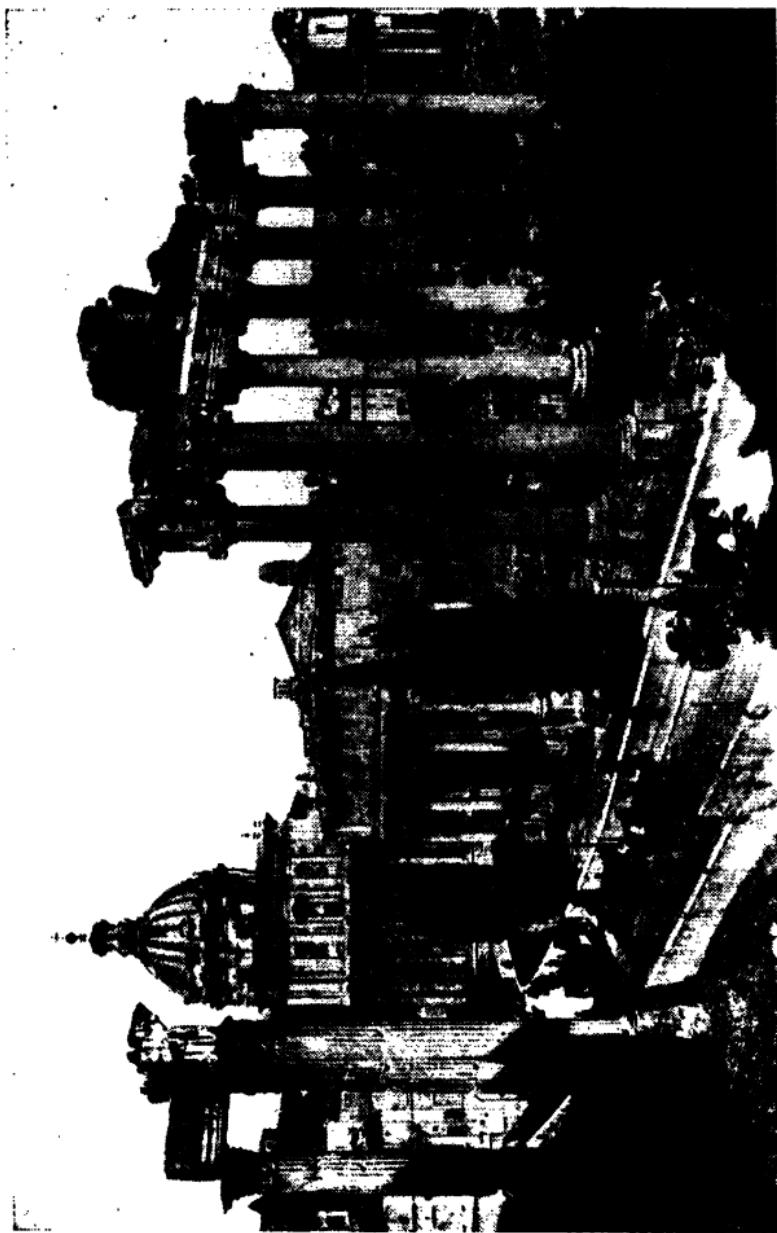
মিলানোতে মিলন

কথা ছিল মিলানোতে আমাদের দেখা হবে। বন্ধু আস্‌বেন ভিয়েনা থেকে। আমি যাবো লণ্ডন থেকে। মিলানো ইটালীর সব-চেয়ে বড় শহর, সেখানে আমরা কেউ কোনো দিন যাইনি, তবে কেমন করে দেখা হবে বলো তো? ছোট শহর হ'লে রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে দেখা হতো, কিম্বা কোন একটা গির্জেতে।

বন্ধু লিখেছেন, মিলানোর হোটেলগুলোর নাম তুমিও জানো না, আমিও জানিনে। কিন্তু স্টেশনে নিশ্চয়ই রেস্তেরাঁ থাক্‌বে। সেই রেস্তেরাঁতে অমুক তারিখের সন্ধ্যায় আমি তোমাকে খুঁজবো, তুমি আমাকে খুঁজবে। কেমন?

আমি ভাবছি, বাঃ, মিলানোতে যদি একই স্টেশনে লণ্ডনের গাড়ী ও ভিয়েনার গাড়ী না দাঁড়ায়! কাশীর গাড়ী ও ঢাকার গাড়ী কি কলকাতার একই স্টেশনে দাঁড়ায়? আর রেস্তোরাঁতে দেখা হবার কথা যে লিখেছেন, ধরো যদি আমি দুপুর বেলা পৌঁছাই আর তিনি পৌঁছান রাত্রি দশটায়, তবে কি আমি আট ঘণ্টা রেস্তোরাঁতে বসে থাক্‌বো না কি? আর নেহাৎই যদি তিনি ট্রেন ফেল্‌ করেন তবে রেস্তোরাঁতে ঘুমুতে দেবে না কিন্তু। এদিকে আমি ইটালিয়ান ভাষায় বিদ্যাসাগর। এত বড় পণ্ডিত যে, নিজের মতো পণ্ডিত ছাড়া যার-তার

সঙ্গে কথা বললে মান যায়। ইতর সাধারণের সঙ্গে আমি ইংরেজীতেই কথা কইব স্থির করেছি।

বন্ধুকে চিঠি লেখবার সময় ছিল না। টাইম্-টেব্‌ল দেখে, 'তার' করে দিলুম। মিলানোতে পৌঁছাবো সন্ধ্যা ছ'টায়।

তারপরে লণ্ডনে সেই আমার শেষ দিন। বন্ধু-বান্ধবের কাছে বিদায় নিতে নিতে ও বাজার করতে করতে এত দেরি হলো যে বাধ্য হয়ে ভিক্টোরিয়া স্টেশন পর্যন্ত ট্যাক্সি করতে হোলো। ট্যাক্সিতে বসে টাইম টেব্‌লটা আরেকবার উল্টে দেখ্‌ছি, হঠাৎ চোখে পড়ল, আছে, আরো একটা ট্রেন আছে। সেটা ছাড়ে তিন ঘণ্টা পরে, পৌঁছায় তিন ঘণ্টা আগে, কিন্তু যায় অন্য একটা লাইন দিয়ে।

তখন স্টেশনের **Enquiry Office**-এ গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, এ ট্রেনটা যদি হারাই তবে অন্যটাতে জায়গা পাবো কি না। ওরা বললে, নিশ্চয়। আমি বললুম, ওটা এত ভালো ট্রেন যে ওতে সকলেই যাবে, আগে জানলে রিজার্ভ্ করতুম। ওরা বললে, ভয় নেই। আজকাল খুব বেশী লোক ইটালী যাচ্ছে না।

ভীষণ খিদে পেয়েছিল, লাঞ্চ খাবার সময় হয়নি।—স্টেশনের রেস্তোরাঁতে গিয়ে ঢুকলুম। এদিকে আমার কোনো কোনো বন্ধু প্ল্যাট্‌ফর্মে আমাকে বিদায় দিতে আস্‌বে, কথা ছিল। সেই জন্যে খুব তাড়াতাড়ি যা পাওয়া গেল তাই খেয়ে নিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মে ছুটলুম। কেননা যে ট্রেনে আমার যাবার কথা, সে-ট্রেন ছেড়ে গেলে ওরাও নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে, ওদের

সঙ্গে দেখা হবে না। ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে আমি হাজির! ওরা আমার স্যুটকেস্ হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ট্রেনে তুলে দিতে চায়—বোধ করি আমাকেও চ্যাংদোলা করে ট্রেনে চাপিয়ে দেবে, এমন সময় আমি বললুম, বন্ধুগণ, দু' ঘণ্টা পরে একটা উঁচুদরের ট্রেন আছে, সেইটেতেই আমি যাবো। ওরা তো চটে লাল! বললে, তোমার জন্যে আমরা ততক্ষণ ঘাস কাটি আর কী! আমি বললুম, তোমরা তো বেশ বন্ধু হে! একটা লোক লণ্ডন থেকে ইটালী হ'য়ে ভারতবর্ষে চলে যাচ্ছে, তোমরা ভাব্‌ছ গেলে বালাই যায়! না?

ওরা ভারি অপ্রস্তুত হয়ে বললে, তোমার জন্যে আমাদের লাঞ্চ্ খাওয়া হয়নি, কলেজে যাওয়া হয়নি—এমনি কত কথা। আমি বললুম, এসো তোমাদের খাওয়াই আগে। ওরা খেল, কিন্তু আমার খরচে না। আমি বললুম, ভগবান যখন তোমাদের সুমতি দিয়েছেন তখন আমি পীড়াপীড়ি করবো না। আমার পকেট খালি। মিলানোতে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা যদি কাল না হয় তবে টাকার জন্যে একটা তার কর্‌বার সঙ্গতিও আমার থাক্‌বে না।

ওদের কেউ কেউ দয়া করে' আমাকে খুচরো দু' তিনটে পাউণ্ড ধার দিলে। আমি ওদের নামে চেক্ লিখে দিলুম। বললুম, চেক এখন ভাঙাতে গেলে ব্যাঙ্ক তোমাদের গলাধাক্কা দেবে। কেননা ব্যাঙ্কে আমার টাকা জম্‌তে আরো সাত আট দিন দেরি। তখন যেয়ো।

ওরা বললে, এসো তাস খেলা যাক্। আমি বললুম, বহুৎ খুব। কিন্তু ভিক্টোরিয়া স্টেশনের ওয়েটিং রুমটা যে এমন বাজে তা কি কেউ ভাব্‌তে পেরেছে? টেবিল আছে বিরাট একটা। চেয়ার মাত্র গোটা-কয়েক, সেও পরের দখলে। তাস খেলা হলো না। তখন একজন বন্ধুকে বললুম, এসো আমার কয়েকটা জিনিস কেনবার আছে, কিনে দাও।

চারটের সময় ট্রেনে বসিয়ে দিয়ে বন্ধুরা হাঁফ ছাড়লে। ঘন ঘন রুমাল নাড়্‌তে নাড়্‌তে দু' পক্ষের বিদায়! ট্রেন সোঁ সোঁ করে' ছুটে চলল। ভাবলুম, লণ্ডন ছেড়ে যাচ্ছি হয়তো চিরকালের মতো। লণ্ডনের জন্য দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলি। কিন্তু মনের ওপর পাষাণের মতো চেপে রয়েছে মিলানোতে মিলনের চিন্তা। সেই ভীষণ চিন্তা আমার সকল চিন্তা চাপা দিলে। কখন যে Dover এসে পড়ল খেয়ালই ছিল না।

আমার কামরাতে মোটে একটি সহযাত্রী। তিনি বললেন, এরোপ্লেনে গেলে আমার গা-বমি-বমি করে, সেইজন্যে আমি স্টীমারে চ্যানেল পার হবো। আর স্টীমারে চ্যানেল পার হ'লে আমার স্ত্রীর গা-বমি-বমি করে, সেইজন্যে তিনি লণ্ডন থেকে প্যারিস্ এরোপ্লেনে যাচ্ছেন।

ডোভারে ট্রেন থেকে নেমে তিনি ও আমি ভিড়ের মাঝখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলুম। স্টীমারে আমার প্রায়ই গা-বমি-বমি করে। এবার করল না। সমুদ্র এবার খুব ঠাণ্ডা ছিল। আমি ভাবলুম ইংলণ্ড আমাকে স্নেহের সঙ্গে বিদায় দিচ্ছে।

ক্যালেতে দুটো ট্রেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। একজন কর্মচারী জিজ্ঞাসা কর্‌ল, কোন্ ট্রেন খুঁজছেন? আমি বললুম Bale-এর ট্রেন। সে দেখিয়ে দিল। Douane (Customs House) এর ভিতর দিয়ে যেতে হ'লো না এবার। আমি খুশি হয়ে খুব তাড়াতাড়ি একটা জায়গা দখল ক'রে বস্‌লুম। আগের বারে একটু দেরি করে পস্তাতে হয়েছে।

এবার আমার বরাত ভালো—এক বুড়ী এসে হাঁকলে, রাতের কম্বল? রাতের বালিশ? আমার সঙ্গে বিছানা ছিল না। কারুর সঙ্গে থাকে না। আমি বললুম, দাও। বুড়ী দু' শিলিং আদায় করলে। আমি কতকটা দিল-দরিয়া মেজাজেই ছিলুম। আগের বারগুলোতে অনেক খোঁজ করেও কম্বল বালিশ পাইনি।

আমার কামরায় আরো দুটি কি তিনটি মানুষ ছিল। অন্যান্য কামরা খালি যাচ্ছে খবর পেয়ে তারা সকলেই আমাকে ছাড়্‌লে, কেবল একজন ছাড়া। সেও যাচ্ছিল মিলানো—ইংরেজীতে যাকে বলে Milan।

দু' জনে দুটো বার্থ্ দখল করে' পা ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজলুম। তখন ট্রেন Laon ছুঁয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য ট্রেন Paris ছুঁয়ে যায়। যে ট্রেনটাতে আমার যাবার কথা ছিল, সেটাও Paris ছুঁয়ে যেতো। সেটা ইটালীতে ঢুকতো Mont Cenis দিয়ে। ইটালীতে ঢোক্‌বার আরো অনেকগুলো রাস্তা আছে। একটা Ventimiglia দিয়ে। একটা Como দিয়ে। আমরা যাবো Domodossola দিয়ে। এগুলো হলো লণ্ডন থেকে

যারা যায় তাদের ঢোক্‌বার রাস্তা আর যারা ভিয়েনা থেকে যায় তারা ঢোকে Brenner Pass দিয়ে কিম্বা Tarvisio দিয়ে কিম্বা Trieste-এর কাছ দিয়ে। প্রত্যেকটা রাস্তাই সুন্দর।

ভোর হলো Bale-এ। তারপরে এলো Berne। সেখান থেকে শুরু হলো Bernese Oberland—পাহাড়ের দেশ। অনেকগুলো সুড়ং। কোনোটার ভিতর দিয়ে যেতে পাঁচ মিনিট লাগে, কোনোটাতে এক মিনিটের কম।

রাত্রে কিছু খাইনি। সকালে সুইজারল্যাণ্ডের ধরণে ব্রেক্‌ফাস্ট খেলুম। বেলা বারোটায় ইটালীর ধরণের লাঞ্চ্। Domodossola-য় ইটালীর আরম্ভ। আমাদের দেশের মতো উজ্জ্বল উত্তপ্ত রৌদ্রকে স্নিগ্ধ করছিল পাহাড়, ঝর্ণা ও তরুবীথি। Stresa-র কাছে Maggiore হ্রদের দ্বীপগুলিতে কত লোক বাড়ী করে বাগান করে বাস করছে। তারা কী সুখী!

আমাদের কামরায় দু' একজন ইটালীয় উঠল। কিন্তু তাদের সঙ্গে আলাপ করা আমার বিদ্যেয় কুলোল না। আমার সহযাত্রী ইংরেজটি আরো বিদ্বান। আস্‌ছে ম্যান্‌চেস্টার না লিভারপুল থেকে ব্যবসা সংক্রান্ত কারণে। মিলানোতে কে একজন তাকে নিতে আস্‌বে। পথঘাট, ভাষা ও হোটেলের নাম জানে না!

পৌনে-তিনটের সময় ট্রেন দাঁড়ালো মিলানোর সেণ্ট্রাল স্টেশনে। তখন টিকিট দিয়ে বাইরে গিয়ে পড়লুম। সুট-কেস্‌টা হাতে করে বেড়ানো যায় না। সেইজন্যে সেটাকে

স্টেশনের Cloak room (যাকে এদেশে Left Luggage Office বলে, সেইখানে) জমা দিয়ে একটা রসিদ নিলুম।

তারপর সাহসে ভর করে বেরিয়ে পড়লুম শহর দেখ্‌তে। সঙ্গে একখানা ছোট মানচিত্র ছিল শহরের। তাকেই গুরু করে পথ চিন্‌তে চিন্‌তে 'কুকে'র দোকানে পৌঁছলুম। তারা আমার কাছ থেকে কিছু ইংরেজী মুদ্রা নিয়ে আমাকে ইটালীয় মুদ্রা দিলে। ইটালীয় মুদ্রার বিশেষ দরকার ছিল। ট্রেনে ইংরেজী মুদ্রাতেও কাজ চালানো যায়। কিন্তু ইটালীর দোকানে বা রেস্তোরাঁতে ইংরেজী মুদ্রা দিলে কেউ নেবে কেন? এমন-কি প্ল্যাটফর্ম-টিকিট কিনে বন্ধুকে খুঁজতে স্টেশনের ভিতর যাই যদি, তাহলেও ইটালীয় মুদ্রা লাগে। কাজেই কুকের দোকানে গিয়ে আমি খুব ভালো কাজ করেছি।

কুকের দোকান থেকে ডাকঘরে গেলুম! সেখানে হাত নেড়ে ও ফরাসীর সাহায্যে পোস্টকার্ড কিনে চিঠি লিখলুম লণ্ডনে। তারপর অনেক ঘুরে ফিরে স্টেশনে পৌঁছলুম। পথে ক্যাথিড্রেলটাও চিনে রাখলুম। ছু' একটা হোটেলও যে চোখে পড়ল না তা নয়। কিন্তু আমি না হয় ঘর নিলুম। তারপর বন্ধুকে যদি না দেখতে পাই তবে ছু'জনার ঘরের দাম আমাকে দিতে হয়। আর বন্ধুর সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে নিজের জন্যে ঘর নিয়েছি শুনলে তিনি ভাববেন, স্বার্থপর!

খিদে পেয়েছিল। স্টেশনের কাছের একটা কাফেতে গিয়ে কিছু কেক ও দুধ চাইলুম। কিন্তু ওরা ইংরেজীও বোঝে

না, ফ্রেঞ্চও বোঝে না। তখন জার্মানের যে দু' একটা কথা শিখেছিলুম তাই বলায় কতকটা ঠাহর করল।

স্টেশনে ফিরে যেখানে টাইম-টেবিল আঁটা থাকে সেখানে গিয়ে ভিয়েনার ট্রেন কখন পৌঁছয় তাই খুঁজতে লাগলুম। ইউরোপের একটা মস্ত সুবিধে এই যে রাশিয়ান ছাড়া অন্য সব ভাষার হরফ একই রকম। কাজেই ইটালিয়ান নামগুলো পড়তে কিছুমাত্র কষ্ট হলো না—কষ্ট হতো তামিল কিম্বা গুজরাটী পড়তে।

আমি ধরে নিয়েছিলুম আমার বন্ধু Brenner Pass-এর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পার্বত্য পথ দিয়ে আসবেন, Verona-তে চেঞ্জ করে। সাড়ে ছ'টায় একটা ট্রেন ছিল। সেইটের জন্যে প্ল্যাটফর্ম-টিকিট কিনতে গেলুম। কিন্তু প্ল্যাটফর্মকে ইটালিয়ান ভাষায় কী বলে জানতুম না। কাজেই টিকিট উইণ্ডোতে না গিয়ে প্ল্যাটফর্ম-টিকিট সাধারণত যে যন্ত্রে থাকে সেইরকম একটা যন্ত্রে মুদ্রা ফেললুম। তাতে উঠল কিন্তু টিকিট নয়, চকোলেট।

তখন আমি প্ল্যাটফর্মের প্রবেশ-দ্বারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। নজর রাখলুম যারা প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে পাচ্ছে তারা কোথেকে প্ল্যাটফর্ম-টিকিট সংগ্রহ করছে। অল্প সময়ের মধ্যে ধরে ফেললুম তারা প্ল্যাটফর্মের অদূরস্থিত একটা যন্ত্রে বিশেষ মুদ্রা ফেলছে। মুদ্রার একটি ছিল আমার কাছে। সেইটি ফেলে প্ল্যাটফর্ম টিকিট পেলুম।

প্ল্যাটফর্মে ঢোকবার আগে একবার ওয়েটিং রুমগুলো ভালো

করে দেখলুম। যদি বন্ধু ইতিমধ্যেই এসে থাকেন। তারপরে মনে হলো যদি বন্ধু আজ আস্‌বেন না বলে তার করে থাকেন আমাকে এই স্টেশনের ঠিকানায়? অসম্ভব নয়—কেন না Brenner Pass-এর লাইনে ঠিক সময় কনেক্‌শন পাওয়া যায় না। ট্রেন ফেল করা সহজ।

তখন গেলুম Enquiry Office-এ। ইংরেজীতে বললুম, আমার নামে কোনো টেলিগ্রাম আছে? যে-ছোকরাটি ছিল সে ইংরেজী বোঝে না। বললে, ফ্রেঞ্চ জানেন? ফ্রেঞ্চে যা বললুম তার অর্থ অন্য রকম। সে বললে, এটা টেলিগ্রাফ অফিস নয়, তার করতে চান তো বাইরে গিয়ে করতে হবে। আমিও নড়ি না, সেও বোঝে না। তখন হঠাৎ আমার কোটের পকেটে ইটালিয়ান Word Book খানা আবিষ্কার কর্‌লুম। সেইখানা তার সামনে খুলে ধর্‌লুম। তখন সে একটা লোককে খবর নিতে বললে—সে লোকটা নাকি ইংরেজী জানে। কিন্তু ও হরি! সেও দুটো কথার বেশী জানে না। সে আমাকে নিয়ে মুশকিলে পড়ল। তখন তার মনে পড়ল, স্টেশনে একটি হোটেলের লোক ইংরেজী বোঝে।

সে বললে, কী স্যার? কী ব্যাপার? আমি যেন বন্ধু পেয়ে গেলুম। বললুম আমার নামে যদি কোনো টেলিগ্রাম এসে থাকে খবর নিতে চাই। সে বললে আপনার পাস্‌পোর্ট্‌খানা আমার হাতে দিয়ে আমার সঙ্গে আসুন।

টেলিগ্রাম অফিসে কত লোকের নামে টেলিগ্রাম ছিল, কিন্তু আমার নামে ছিল না।

তখন সেই লোকটির সঙ্গে আলাপ হলো। সে বললে, আমাদের হোটেলে উঠবেন? বললুম কীরকম দর? সে বললে বেশী নয়। আঠারো লিরা। লিরা যে এক শিলিঙের চার ভাগের এক ভাগ—একথা আমার মনে এলো না। একরাত্রি থাকবো, তার জন্যে আঠারো শিলিং চায়। বললুম খাবার সমেত? সে হেসে বললে, তা কী করে হবে? তখন তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, দেখ, আমার বন্ধুকে আনতে প্ল্যাটফর্মে যাচ্ছি। তিনি যা বিবেচনা করবেন তাই হবে।

এবার প্ল্যাটফর্মের টিকিট দিতে গিয়ে দেখি একই টিকিটে দু'বার ঢুকতে দেয় না! নতুন টিকিট কেন্‌বার মতো খুচরো মুদ্রা ছিল না। নোট ভাঙাতে হবে। তখন আবার সেই মানুষটির শরণাপন্ন হলুম!

প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে পায়চারি করছি, এমন সময় পকেট হাতড়ে দেখি, সুট্‌কেসের রসিদটা গেছে হারিয়ে। মাথায় বাজ পড়্‌ল। সুটকেস ফিরে পাবো না, বন্ধুও আস্‌বেন না, রাত্রে হোটেল যদি-বা পাই আঠারো শিলিং দিয়ে—শোবো কী পরে?

কাঁদো-কাঁদো হয়ে পায়চারি করতে লাগলুম! ট্রেন কিছু বিলম্ব করে এলো। একবার চোখ বুলিয়ে গেলুম—কেউ নেই। হতাশ হয়ে প্ল্যাটকর্ম ছাড়তে যাচ্ছি—দূরে কে আস্‌ছে ও? বন্ধু?

ছুটে গিয়ে আশ্চর্য হবার সময় না দিয়ে কাঁধে হাত রাখলুম। বললুম, বন্ধু, আগে আমাকে বাঁচাও। আমার সুটকেসের রসিদ গেছে হারিয়ে।

বন্ধু কিছু বুঝতে পারলেন না। তিনিও রাত জেগে চব্বিশ ঘণ্টা এক ট্রেনে বসেছিলেন। Brenner Pass দিয়ে না। Tarvisio ও Venice দিয়ে। ভয়ানক ক্লান্ত।

তারপর স্যুটকেস্ কেমন করে উদ্ধার করা সে গেল অনেক ব্যাপার। হোটেলের সেই মানুষটি সাহায্য করেছিল। তার হোটেলে উঠলুম—ততক্ষণে বুঝেছি সাড়ে চার শিলিং বাস্তবিক বেশী ভাড়া নয়। রাত্রে খেয়ে দাম দেবার সময় পকেট হাতড়ে দেখি—স্যুটকেসের রসিদ।

১৩৩৭

দেশে

আমার জাহাজ যখন বম্বের ব্যালার্ড পীয়ারে ভিড়ল তখনো আমি ঘুমিয়ে। উত্তেজনায় অর্ধেক রাত ঘুম হয়নি। যেই ভোর হয়েছে অমনি স্টুয়ার্ড এসে জাগিয়ে দিয়ে বললে, বম্বে এসেছে। ক্যাবিনের পোর্টহোল দিয়ে দেখলুম নানা রঙের কাপড় পরা দেদার লোক জাহাজ থেকে ডাক নামাচ্ছে আর বিষম গোলমাল করছে। এত কাল পরে দেশের মাটি দেখে যদি বা আনন্দ হলো, দেশের লোকের মুখরতা যেন আমার কান মলে দিলে।

পনেরো দিন জাহাজে বন্দী থেকে পা দিয়ে ভূঁই ছুঁইনি। জাহাজ থেকে প্রাতরাশ সেরে যেই নেমেছি ইচ্ছা করল বুনো হরিণের মতো আগে খানিকটে দৌড়াদৌড়ি করি। বরাত এমনি মন্দ যে আমার সব চেয়ে বড় ট্রাঙ্কটাকে নিচে নামাতে বলেছিলুম, নিচে খুঁজে পেলুম না। তাই বারম্বার জাহাজের উপর তল করতে করতে একটা ম্যারাথন দৌড় হয়ে গেল।

একজন বন্ধু আমাকে নিতে এসেছিলেন, তিনি আমাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গিয়ে বললেন, এবার বাঙালী-বাবুটি সেজে কলতলায় স্নান করে এসো।

খালি পায় আর খালি গায় এমন আরাম লাগছিল স্নান করে উঠে। ঠাণ্ডা লাগবার ভয় একটুও ছিল না ইউরোপের মতন। বন্ধু ডাল ভাত মাছের ঝোল দই সন্দেশ রসগোল্লা

ইত্যাদির আয়োজন করেছিলেন। আমি লোভ সংবরণ না করতে পেরে খুব কম করেই খেলুম, কিন্তু তার পরিণাম যে কী হবে তা অনুমান করতে পারিনি। বিদেশী খাবার খেতে খেতে পেটটা যে বিদেশী হয়ে গেছে তা কেই বা মনে রেখেছিল!

একদিন বম্বেতে থেকে পদে পদে ভারতবর্ষকে ভালো মনে হতে লাগল। এমন শান্তি কোথায়! পশুপাখী মানুষের সঙ্গে নির্ভয়ে বাস করছে, ছাগলছানা আর মানবশিশু গাছ-তলাতে এক সঙ্গে শোয়াবসা করছে—এ কি ইউরোপে দেখবার জো ছিল! কেমন গভীর মৃদুগতি নম্র মেয়েগুলি, কত রকমের পাগড়ি বাঁধা মরাঠা গুজরাতী কাবুলী মাদ্রাজী পারসী মাড়োয়ারী ইত্যাদি পুরুষ! এত জাতের মানুষকে নিজের ছেলে বলবার অধিকার ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন দেশের আছে! দেশের সব কিছু আমার মিষ্টি লাগছিল। আমাদের গোরুগুলি যেন আরেকটা জাতের জীব। ইউরোপের গোরুর থেকে এত আলাদা রকম এদের ভাবময় চাউনি, এদের মানুষের সঙ্গে সস্নেহ ব্যবহার, এদের ক্ষুদে ক্ষুদে গড়ন। ইউরোপের গোরুগুলো রাক্ষুসে জানোয়ার। মানুষের সঙ্গে ওদের এমন মৈত্রী নেই বলেই ওদের মাংস খেতে মনে লাগে না।

ট্রেনে উঠে কলিক আরম্ভ হলো। সারা রাত সারা দিন পেটের ভিতর সমুদ্র মন্থন চলল। জানালা দিয়ে ভারতবর্ষকে দেখে তৃপ্তি হচ্ছিল না। মাঠ, পাহাড়, চেনা গাছ, গোরুর গাড়ী, কৃষাণ, সন্ন্যাসী, গরম চা-ওয়ালা, প্রচুর রৌদ্র, তারাময়

রাত, হিন্দী গান, ওড়িয়া কথা, বাংলার ধানভরা ক্ষেত, কলকাতা।

তার পর মুখ দিয়ে বেফাঁস ইংরেজী বুলি বেরিয়ে যায়। পায়ে পা লেগে গেলে "সরি" বলে ফেলি। কিছু একটা চাইতে গেলে "এক্স্‌কিউজ্‌ মি" ও পেলে "থ্যাঙ্ক ইউ"। কিন্তু দু' দিনেই সব ঠিক হয়ে গেল। বাবার সঙ্গে খাবার সময় ছুরি কাঁটার অভাবে হাত সুড়সুড় করছিল না এবং জল দিয়ে হাত মুখ ধোবার সময় অসোয়াস্তি বোধ হচ্ছিল না। কেবল কষ্ট হচ্ছিল মেজের উপর আসন পেতে বসতে।

এখন ইউরোপকে মনে পড়ে কি না? খুব মনে পড়ে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে ফিরে যাই। এবার তো পথঘাট জানি। ক'দিনেরই বা পথ! Cook-এর দোকানে টিকিট কিনে কলকাতা থেকে বম্বে, বম্বে থেকে মার্সেল্‌স্‌, মার্সেল্‌স্‌ থেকে যেখানে খুশি। পৃথিবীটা নেহাৎ ছোট মনে হচ্ছে। সব যেন নখদর্পণে।

এখন মনে হচ্ছে ইউরোপে গিয়ে আর য়্যাডভেঞ্চার নেই। য়্যাডভেঞ্চার আমার এই জেলায়। এখানে কথায় কথায় ট্রেন ট্যাক্‌সি বাস্‌ পাওয়া যায় না, এমন রাস্তাও আছে যাতে সাইকেল চলে না, এমন জায়গাও আছে যেখানে গোরুর গাড়ীও যায় না। পায়ে হাঁটায় মতো য়্যাডভেঞ্চার এ যুগে আর কী আছে!

আমার ঘরের সামনে একটা চতুষ্কোণ মাঠ। তাতে গোরু বাছুর ছাগল ছাগলছানা গাধা ও ভেড়ার ভিড়। শালিক টিয়া

কাক কোকিল শ্যামা দোয়েল ফিঙে চড়ুই মুরগী চিল দিন রাত কাছে কাছে ঘুরছে ও গলা সাধছে। অসংখ্য ফুল ও আমের মুকুল এমন সুগন্ধ দেয় যা ইউরোপে কখনো পাইনি। 'যে যায় সে গান গেয়ে যায়' আমার ঘরের পাশের রাস্তায়। সুখে আছি।

তবু ইউরোপের জন্যে মন কেমন করে। ওখানে যে আমার কত প্রিয় জন আছে!

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
ফাল্গুন চৈত্র ১৩৩৬